জাহাজডুবি

সত্যব্রত রায়

জ্ঞান নিকেতন
১৮এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রকাশকাল/
ফাল্গুন, ১৩৭১

প্রকাশক/
সুনীল বসু
জ্ঞান নিকেতন
১৮এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

পরিবেশক

দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলকাতা-১২

নৃত্যলাল শীলস্ লাইব্রেরী
২০২, বিধান সরণী,
কলকাতা-৬

গ্রন্থ ভারত
৪১বি, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলকাতা-২৬

সুশীল কুমার ঘোষ
ন্যাশান্যাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৭, এন্টনী বাগান লেন,
কলিকাতা-৯

মু। খ। ব। ন্ধ

জাহাজডুবি শুনলে যা মনে হয় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তার বিপরীত। জাহাজডুবি একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা নয়, কৌতুকরসের একটি বই প্রথম রচনার নামই যার পরিচয়লিপি।

হাসিয়ে দেবার বইএর কান্না জাগানো নাম দেওয়াটা কিন্তু নেহাৎ আকস্মিক একটা অন্যমনস্ক ভুল বোধহয় নয়। এই বইএর রচনাগুলির কয়েকটি পড়বার পর সেই সন্দেহই জাগে। লেখক প্রথম নামকরণেই পাঠকের সঙ্গে একটু রসিকতা করেছেন বলে মনে হয়।

এ রকম রসিকতা দিয়ে শুরু করা অবশ্য সাহসের ব্যাপার। বিশেষ করে নবাগত কোন লেখকের পক্ষে। হাত যদি সত্যিই পাকা না হয় তাহলে প্রথম চালাকির টাল সামলান দায় হতে পারে।

'জাহাজডুবি'র লেখক শ্রীসত্যব্রত রায় সম্বন্ধে এটুকু অন্ততঃ অনায়াসে বলা যায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বেসামাল তিনি কখনো হ'ন নি।

সবশুদ্ধ জড়িয়ে সমস্ত বইটি যে বেশ উপভোগ্য হাসি ঝলমল রসাল সওদার পসরা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সমাজ সংসারের টেরা বাঁকা দেখবার যে প্রসন্ন অথচ মর্মভেদী দৃষ্টি না থাকলে কৌতুক রসের কারবারেই নামা যায় না, লেখকের তা আছে, সেই সঙ্গে কলমও তাঁর ধারালো। সুতরাং এ বইটির পরেও সত্যব্রত রায় নামটা সাহিত্যের আসরে আরো স্পষ্টভাবে শোনবার আশা নিশ্চয় করতে পারি।

বাংলা সাহিত্যে কৌতুকরসই একটু বাড়ন্ত। সেই জন্যেই 'জাহাজডুবি'র লেখকের মধ্যে যে ক্ষমতাটুকুর পরিচয় পেয়েছি তাতেই উৎসাহবোধ না করে পারছি না।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

লেখকের কথা

লেখকের ভূমিকার কোন প্রয়োজন ছিল না। শুধু কয়েকটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যই এটুকু লিখতে হচ্ছে।

পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র এই বইএর মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন। প্রখ্যাত ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পী শ্রীচণ্ডী লাহিড়ী প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন। এঁদের আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

অনুজপ্রতিম শ্রীমান সমীর নারায়ণ বিশ্বাস মোট আঠারটি গল্প নির্বাচন করেছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট পরিসর চোদ্দটি গল্পে ভরে যাওয়ায় বাকী গল্পগুলি বাদ দিতে হল। শ্রীমিহির কুমার সান্যাল, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তর বসু, অমরেন্দ্র সান্যাল, দীনবন্ধু বসু ও অরুণ সেনগুপ্ত আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন।

৩, মতিলাল রায় লেন,
পোঃ ভদ্রকালী (উত্তরপাড়া)
॥ হুগলী ॥

সত্যব্রত [signature]

উ । ৎ । স । র্গ

অধ্যাপক শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

শ্রীসুজীব রঞ্জন রায়

শ্রীচরণেষু

॥ সূচী ॥

জাহাজড়ুবি

জাহাজডুবি

"আর্তনাদ" পত্রিকার সম্পাদক ভারবি সেন বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর পত্রিকার জন্য প্রকৃত আধুনিক কবিতা পাচ্ছেন না। আমার লেখার অভ্যাস নেই। কিন্তু সম্পাদক মশাই আমার বন্ধু। তাই সান্ধ্য চায়ের আসর উপভোগ করতে রোজই আর্তনাদ পত্রিকার, অফিসে যাই। ভারবি সেন আমাকে দুঃখ করে বললেন,—'দেখুন মশাই, প্রকৃত আধুনিক কবিতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য 'আর্তনাদ' পত্রিকার জন্ম। চার দেওয়ালের মধ্যে যে সব আধুনিক প্রতিভা আবদ্ধ হয়ে আছে, তাদের আমি জাগিয়ে তুলতে চাই। তাই এ 'আর্তনাদ' হল অবহেলিত তরুণ প্রতিভার করুণ আর্তনাদ।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

বললাম—'কাগজে কোন বিজ্ঞাপন দিয়েছেন কি?'

ভারবি সেন বললেন,—'হ্যাঁ, দিয়েছি বৈ কি!—এই তো দেখুন।'

দেখলাম এক বিখ্যাত দৈনিকে ছোট্ট করে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে,—'অকালে-ঝরতে-নেওয়া যে সব তরুণ আধুনিক প্রতিভা কোন সুযোগ পাচ্ছেন না, তাঁরা সন্ধ্যায় 'আর্তনাদ' কার্যালয়ে সশরীরে কবিতাসহ সম্পাদক ভারবি সেনের সঙ্গে দেখা করুন।

তখন সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে আমার চা আর খোশগল্প শুরু হয়েছে। এর ওপর যদি আধুনিক কবিতা আসতে শুরু করে তাহলে চায়ের আসর সত্যি খুব জমজমাট হবে।

"আসতে পারি?"—দরজার আড়াল থেকে একটি ভারী গলা শোনা গেল

"আসুন, আসুন"—সেনমশাই সাগ্রহে অভ্যর্থনা করলেন।

ভদ্রলোক পরিচয় দিলেন। নাম শ্রীভজহরি গুঁই। শহরের নাগরিক সভ্যতা থেকে বেশ কিছুটা দূরে এক গ্রামে বাস করেন। তাঁর চেহারা নির্বিবাদী গোবেচারী ভাল মানুষের মতো। তবে মনে মনে মহাকবি হওয়ার আকাঙ্খা। সঙ্গে বগলদাবায় ছোট ছোট করে লেখা প্রায় চার কেজি ফুলস্ক্যাপ কাগজ। ভজহরিবাবু বোধহয় তাঁর মহাকাব্যখানি সঙ্গে এনেছেন।

ভারবি সেন জিজ্ঞাসা করলেন,—'ওগুলো কি?'

—"আজ্ঞে, এটা একটা মহাকাব্য। নাম 'জাহাজডুবি।"

—'জাহাজডুবি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। মানে কাগজে দেখলাম কি না। নূতন নূতন প্রতিভাকে সাদরে . তাই মানে, এটা সঙ্গে করেই নিয়ে এলাম।'

ভারবি সেন হতভম্ব। আমিও নির্ব্বাক। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। ভজহরি বাবু তাঁর মহাকাব্যখানা বগল থেকে নামিয়ে পড়তে লাগলেন,—

হংসগুলি দলে দলে সুন্দর সরসীজলে
খেলে কিবা কুতূহলে আহা
আনন্দে ভেকের দল করে নিত্য কলরোল
দেখ সখি দেখ দেখ তাহা।

'খুব হয়েছে।'—সম্পাদকের কথায় ভজহরিবাবু হকচকিয়ে গেলেন।. কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম, মন্দ কি, চলুক না। সন্ধ্যাটা ত' ভালই কাটছে। তাই ভারবি সেনকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম আরও কিছুক্ষণ চলুক।

সেনমশাই ভজহরি বাবুকে বললেন,—আপনার মহাকাব্যের গোড়াটা ত' বুঝলাম, এবার মাঝখান থেকে একটু পড়ুন।'

ভজহরিবাবুর উড়ে-যাওয়া প্রাণটি আবার ধড়ে এল। তিনি ত্রাস্তব্যস্তে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মাঝখানে এলেন,—

ভীমদন্ত কড়মড়ি উদ্বাহু হইয়া নৃত্য করিব এখন,
লঙ্কায় রামেরে হেরি বজ্রনাদ করেছিল রাবণ যেমন।

"ব্যস্ ব্যস"—বিকট হাসি চাপতে গিয়ে ভারবি সেনের মুখ তখন লাল হয়ে গেছে। তিনি কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন,—"ঠিক আছে, ঠিক আছে, এবার শেষটা পড়ুন।"

ভজহরিবাবু আবার শুরু করলেন,—

আপন ডালেতে বসি কালিদাস যেমতি
কাটিতেছিলেন ডাল, আমিও তেমতি
জাহাজডুবির শেষে অগাধ সলিলে
অমৃতের সুধা পান করি কুতূহলে।

মহাকাব্যের শেষটুকু পাঠ করে শ্রীভজহরি গুঁই গোরুর মত অর্থহীন ড্যাব-ড্যাবে চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভারবি সেন কেন যেন মুখটাকে আড়াল করবার জন্য জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর প্রকৃতিস্থ হয়ে আবার ভজহরিবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন,—

"দেখুন ভজহরিবাবু, একটা কথা আপনাকে বলতে চাই। মহাকাব্যের যুগ শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া বিজ্ঞাপনে ত' স্পষ্টই লেখা ছিল যে আধুনিক কবিতা আনতে হবে। কাজেই এখন আর এসব কেন?" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—"আপনি কি বলেন?"

বললাম, বটেই ত'।

আমাকে নিরপেক্ষ মনে করে ভজহরিবাবু বললেন,—"কিন্তু মহাকাব্যের কি শেষ হওয়া উচিৎ? বরং মহাকাব্যই চিরজীবী হোক। আপনি কি বলেন?"

বললাম, বটেই ত'।

তবে ভারবি সেনের হৃদয় অত্যন্ত কোমল। তিনি তাই ভজহরিবাবুকে বললেন,—"আপনার 'জাহাজডুবি' আপনি ফেরত নিয়ে যান ভজহরিবাবু। এ কবিতা আমি চাইনি। আপনাকে আধুনিক কবিতা লিখতে হবে। বর্তমান জীবনের সভ্যতা-অসভ্যতা-নগ্নতা, ক্লান্তি-বিক্ষোভ-মিছিল, সাদা বাঘ, পাঁউরুটির লাইন, স্পুটনিক প্রভৃতি নিয়ে কবিতা লিখতে হবে।"

একটু দম নিয়ে সেনমশাই আরও বললেন,—"একেবারে শেয়ালদা স্টেশন থেকে হ্যারিসন রোড, কফিহাউস, গোলদীঘি, হেদুয়া, গড়ের মাঠ, লেক সবকিছু ঢুকিয়ে দিতে হবে। ক্ষণকালীন দৃশ্যকে চিরকালীন করতে হবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা, মনের ভাব শুধু গড়ের মাঠ আর লেকে গিয়ে থামলেই চলবে না, তাকে বাস-ট্রাম টেম্পো আর জেট প্লেন ছুঁয়ে চলে যেতে হবে সুদূর সেন্ট-হেলেনায়।"

ভজহরিবাবু এতক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিলেন। তারপর, কি

বুঝলেন জানিনা, নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন। ভারবি সেনও তাড়াতাড়ি উঠে "আর্তনাদে"র অফিস সেদিনকার মত বন্ধ করে দিলেন, পরদিন আবার চায়ের আসরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমিও উঠলাম।

পরদিন। আমরা সবে গল্পে জমে উঠেছি, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। এ কী! আবার সেই ভজহরি গুঁই। গুঁইমশাই আজ একটু সপ্রতিভ হয়েছেন। অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন,—"নাগরিক জীবনের মহাসমস্যাগুলি ঠেলে ঢুকিয়ে একটি মহাকবিতা লিখে এনেছি। মহাকবিতাটির নাম "এক টুকরো নাগরিক সভ্যতা।" আপনি যা বলেছেন, তাই করেছি।"

ভজহরি আর অপেক্ষা করলেন না। পড়তে লাগলেন,—

নিতম্বিনী উরুস্তম্ভ নারীকুল এবে
ঘুরায়ে অক্ষিগুলি ঢুলায়ে আনন
চোঙা প্যান্ট পানে চায় কী অস্থিরমতি!
হাস্যে লাস্যে ঢলঢলি কলহাস্য করে।

আমি দেখলাম,—মন্দ কী! বেশ তো চালিয়েছেন ভজহরিবাবু। তাই উৎসাহ দেওয়ার জন্য আবেগভরে বললাম,—"বাঃ"

দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে ভজহরিবাবু পড়তে লাগলেন,

পঞ্জরসর্ব্বস্ব ঐ যুবকেরা হায়
চোঙা জুতা চোঙা প্যান্টে সর্বাঙ্গ আবরি
বাপেদের ঘর্মঝরা অর্থগুলি লয়ে
মুক্তনাভি নারী সনে কফি ধ্বংস করে।

এবার ভারবি সেনও তাঁর 'সিরিয়স' ভাবটা কাটিয়ে নিয়েছেন। তিনিও বললেন,—"বাঃ"

ত্রিগুণ উৎসাহে ভজহরিবাবু শুরু করলেন,

কফিহাউসেতে কত মস্তিচ্ছন্ন যুবা,
গোলদীঘি, হেদো আর বালিগঞ্জ লেকে
উল্লম্ফনে সগর্জ্জনে শ্বেতব্যাঘ্রসম
যুবতীরে পেতে চায় নিরিবিলি দেখে।
(আহা! পাঁউরুটির লাইনে বুঝি আছেন পিতামাতা!)

আমি বলে উঠলাম,—গুড ভজহরিবাবু, গুড।

চতুর্গুণ উৎসাহে ভজহরিবাবু প্রায় চিৎকার করে পড়তে লাগলেন,

শেয়ালদা ষ্টেশন হতে সেণ্ট হেলেনায়
বাস-ট্রাম-টেম্পো কিংবা জেট্‌-প্লেনে চড়ি
যত্র যাও তত্র বন্ধু পশিবে নিশ্চয়
ঢলাঢলি কেলেঙ্কারী ; উঃ দুর্গন্ধেতে মরি।

কবিতা পাঠ শেষ করে শ্রীভজহরি গুঁই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। সার্থক কবিতাসৃষ্টির তৃপ্তিতে তাঁর চোখমুখ তখন চকচক করছে। ভারবি সেন বেশী কথা বাড়ালেন না। বললেন,—"ভজহরিবাবু, আপনার কবিতা আমার কাছে রেখে যান। ছাপা হলে সময়মত জানিয়ে দেব।" ভজহরিবাবু কৃতজ্ঞচিত্ত বিদায় নিলেন।

আমি ভারবি সেনকে বললাম,—"এ কবিতা রাখলেন কেন?"

সম্পাদকমশাই বললেন, "দেখলেন ত' মশাই, কি লিখতে বলেছি আর কি লিখে এনেছে? কবিতাটা ফেরত দিলে আবার কি দিয়ে কি করে আনতো। তারচেয়ে নিজের কাছেই রেখে দিলাম। অন্ততঃ কয়েকদিন ত' ও ব্যাটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।"

মনে হল ভারবি বাবুর কথাই ঠিক।

আবার দরজায় টোকা পড়ল। সেনমশাই বললেন,

'—কে! ভেতরে আসুন।'

এবার একজন বাইশ-তেইশ বছরের ছিপছিপে যুবক এলেন। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছেঁটে সাবান কিংবা সাম্পুতে রুক্ষ করা। জামা ও প্যাণ্ট আঁটসাঁট হয়ে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে।

—'কি নাম আপনার?' সেনমশাই জিজ্ঞাসা করলেন।

—'সুন্দরম্ পুরকাইত। আমি কলকল সাহিত্য মন্দির থেকে আসছি।'

—'বেশ কি এনেছেন পড়ুন।'

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি প্লাস্টিকের বালতি-ব্যাগ থেকে একটি কাগজ বের করে পড়তে লাগল,—

আমি তোমাকে খুন করে ফেলে দেবো শিপ্রা!
আমার সমস্ত 'সলিলকি' জুড়ে

তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে...
কিন্তু তোমার 'মনোলগে'
আমি নিজেকে অনেক খুঁজেছি
কম্‌সে কম্‌ ১০০০ বার খুঁজেছি
এবং সেখানে শুধু
মরীচিকা, মরীচিকা ধু ধূ
তাই আমি তোমায় খুন করে ফেলবো শিপ্রা
একেবারে চৈনিক পিস্তল দিয়ে।
তারপর ?—তারপর বোরোবুদুরের পথে
তোমার মরা লাস থেকে তাজা রক্ত নিয়ে
তোমারই পায়ে অঞ্জলি দেব শিপ্রা।

"Stop it !" গর্জন করে উঠলেন ভারবি সেন,—"এটা কবিতা হয়েছে, না কচুপোড়া হয়েছে বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান বলছি।"

শ্রীপুরকাইত্ . সম্পূর্ণ হতভম্ব হয়ে রইলেন। তারপর সেনমশায়ের দিকে কটমট করে তা[illegible]য়ে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেলেন। সম্পাদক মশাই তখন উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছেন। তিনি আমাকে বললেন—বলুন তো মশাই, আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা আমি কি করে এদের বোঝাবো।"

আমি বললাম,— " [illegible]গে, দুঃখ করবেন না। আর কটা দিন ধৈর্য ধরেই দেখুন না।"

আবার একটি নারীকণ্ঠের আওয়াজ এল। মেয়েটির গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, পরনে লাল নাইলনের শাড়ী। রুজ-লিপষ্টিক প্রভৃতি যাবতীয় প্রসাধনে মেয়েটির মুখ ঠিক মুখোশের মত লাগছে। [illegible] মতো করে ইনি বললেন,—

"আমার নাম পাপিয়া ধর। নিউ আলিপুর থেকে [illegible]ছি। 'আর্তনাদ' পত্রিকার জন্য একটা ভীষণ ভাল কবিতা এনেছি[illegible]...

দুজনেই সমস্বরে বলে উঠলাম, "বেশ তো, পড়ুন।"

পাপিয়া ধর কলকলিয়ে শুরু করলেন,—

আমার ভীষণ ইচ্ছা করে 'হিপি' হতে

খু—ব! খু—ব!
হনলুলুতে যেতে বড্ড ইচ্ছা করে
চু—প! চু—প!
তাই ঘুরঘুর মনে দুরদুর বনে যেতে চাই
নির্মোক নাচে চুপচুপ করে পেতে চাই
তোমাকে ফিয়াসে তোমাকে।

একটি প্রচণ্ড শব্দ হ'ল। দেখি চেয়ার উল্টে "আর্তনাদ" পত্রিকার সম্পাদক ভাববি সেন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন। আমি বিশেষ বিব্রত হয়ে ঘরের এককোণে রাখা কুঁজো হাতে নিয়ে বন্ধুবরের মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগলাম। এই চরম উত্তেজক আবহাওয়ায় পাপিয়া ধর প্রায় কান্নার মত ক' বললেন, —আমি এখন কি করবো?

আমি বললাম,—কবিতাটি টেবিলের ওপর রেখে আপনি আজকের মতো আসুন। সম্পাদকের জ্ঞান ফিরলে তাঁর কাছে আপনার কথা [illegible] করব।

পাপিয়া ধর ফুলঝুরির মতো হেসে একটি ডানামেলা গাড়ী চেপে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই সম্পাদকের জ্ঞান ফিরেছিল। কিন্তু সেদিন তাঁর সঙ্গে আর কোন কথা হয়নি। 'আর্তনাদের' অফিস বন্ধ করে [illegible] বাড়ী ফিরে গিয়েছিলাম।

পরদিন আবার সেই বৈচিত্র্যময় জগতে চা-বিস্কুটের লোভে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। অফিস ঘর খোলা। একটি আসবাবও নেই। আর্তনাদের সাইনবোর্ড কোথায় গেল?

পাশের একটি দোকানে জিজ্ঞাসা করে জানলাম ভাববি সেন আর্তনাদের [illegible] সাইনবোর্ড একটি টেম্পোয় চাপিয়ে দেশে ফিরে গেছেন। [illegible] করেই পত্রিকাটি গেল। তবে যেটুকু খবর পেয়েছি তাতে বুঝেছি [illegible] সেন দেশে ফিরেও চুপ করে বসে নেই। তিনি আধুনিক কবিতার একটি ব্যাকরণ লেখার চেষ্টা করছেন।

সত্যব্রত রায়

যমরাজার চাবি চার

হঠাৎ এমন করে মরে যাব ভাবতেই পারিনি। ভেবেছিলাম দীর্ঘায়ু হব। কমপক্ষে আশীবছর যাবৎ পৃথিবীর আলো দেখব। কিন্তু,—মরেই গেলাম। সব আশা-আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্তই রয়ে গেল। শুধু একটি লাভ হয়েছে। তিরিশ বছরের মেয়াদে আমি একটি দশহাজার টাকার জীবন-বীমা করেছিলাম। দু'বছর প্রিমিয়াম দিয়েছিলাম। আর মাত্র আঠাশ বছর বাকী ছিল। ওই আঠাশ বছর আর টানতে হল না। তার আগেই মরে গেলাম।

আত্মা আছে কি নেই তা নিয়ে জীবন্ত অবস্থায় কোনদিনমাথা ঘামাইনি। দেহটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাইভস্ম গঙ্গায় নিক্ষেপ করার পরও যে দেহের অতিরিক্ত কিছু থাকে,—এ আমি কল্পনা করতে পারতাম না। কিন্তু এখন আমার চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমি মৃত্যুর পরেও দেখছি, শুনছি। আমার শরীর নেই বটে, কিন্তু অশরীরী আত্মা (আপনারা আমাকে ভূত-প্রেত ভাববেন না যেন।) হয়ে খুশীমত যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি।

মৃত্যুর পর আমি এখন যমপুরীতে আছি। যমরাজার প্রাসাদটা কি সুন্দর! স্থাপত্যশিল্পে এরা আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই বিশাল লম্বা-চওড়া প্রাসাদে কি সুন্দর কারুকার্য! দেখে দেখেও দেখার আশ মেটে না। যাইহোক, আমার মৃত্যুর পর যমরাজার দুই দারোয়ান (থিয়েটারের মহারাজার মতন সাজ) আমাকে টেনে নিয়ে গেল সোজা যমরাজার হাইকোর্টে। রাজপ্রাসাদের মধ্যেই হাইকোর্ট। প্রাসাদের মধ্যে কলকাতার গড়ের মাঠের মত স্থান জুড়ে একটি হলঘর। সেখানে সোনার সিংহাসনে বসে আছেন

জাংকডুবি

যমরাজা স্বয়ং। সিংহাসনের একধাপ নীচে পঁচিশজন জুরীর আসন। ঘরের দরজাগুলিতে দারোয়ানরা যাত্রাদলের মহারাজার পোষাক পরে দাঁড়িয়ে বিশাল বিশাল গোঁফে তা' দিচ্ছে। যমরাজার সিংহাসনের দুইদিকে দুটি কাঠগোড়া। জুরীদের একধাপ নীচে হেডক্লার্ক চিত্রগুপ্ত। আশেপাশে কুড়ি/পঁচিশজন চিত্রগুপ্তের সহকারী। সারা ঘরময় একলক্ষ সোফা। তাতে একলক্ষ পৃথিবীর মানুষ বসে আছে। আমাকেও নিয়ে গিয়ে একটি সোফায় বসিয়ে দিল। আমি চুপ করে বসে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পরে বিচিত্র বাজনা বেজে উঠল। হাইকোর্টের বাইরে যমরাজার কয়েকহাজার কর্মচারী সিঙ্গা ফুঁকতে লাগল। পনের ফুট ব্যাসের একটি চামড়ার ঢালের ওপর পনের কিলো ওজনের হাতুড়ীর ঘা পড়তে লাগল। এমন বিচিত্র বাজনা ত' পৃথিবীতে শুনিনি! হঠাৎ সিংহাসনের ওপর থেকে যমরাজা হীরে বসান সোনার হাতুড়ী ঠুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাজনা বন্ধ হয়ে সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। যমরাজা উঠে দাঁড়ালেন। সোফায় উপবিষ্ট লক্ষাধিক মানুষের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'এবার তোদের বিচার হবে।'

বিচার শুরু হল। চিত্রগুপ্ত ঘোষণা করলেন,—'প্রথমেই ৺অবিনাশ পাকড়াশীর বিচার হবে।

৺অবিনাশ পাকড়াশী কাঠগোড়ায় দাঁড়ালেন। চিত্রগুপ্ত বিশাল খাতা খুলে বললেন,—'ইওর এক্সেলেন্সি এ্যাণ্ড জেন্টলম্যান অব দি জুরী! এই বেয়াদপ ৺অবিনাশ সারা জীবনে প্রচুর অন্যায় করেছে। এর যা কীর্তিকলাপ, তা' এতলোকের সামনে উচ্চারণ করা যায় না। আপনি খাতাটা দেখুন!'

একজন সহকারী সেই বিশাল খাতা নিয়ে যমরাজার সিংহাসনের সামনে একটি সোনার টুলের ওপর রাখল। যমরাজা খাতার পাতায় দৃষ্টি দিয়ে লজ্জায় আলতার মত লাল হয়ে উঠলেন।

তারপর ৺অবিনাশের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'ছিঃ তুই জীবনব্যাপী এত অপকর্ম করলি? নিজ স্ত্রীকে প্রহার, মদ্যপান, অপর নারীতে আসক্তি, দিবারাত্র দলাদলিপ্রিয়তা, কর্মস্থলে চুকলি-প্রদান, ঘোড়দৌড়ের মাঠে আসক্তি উঃ

৺অবিনাশ—আজ্ঞে, তেমন কিছু নয়!

যমরাজা—কর্মস্থলে চুকলি করতি কেন?

৺অবিনাশ—আজ্ঞে, করে খেতে হবে তো? অপরের নামে চুকলি করলে নিজের সুবিধা হয়। তাই একটু—

যমরাজা—আর দিবারাত্র ফন্দীপ্রিয়তা?

৺অবিনাশ - আজ্ঞে, নিজের সুখ-আহ্লাদ বজায় রাখার জন্য যাকে তোলা দরকার তাকে তুলতাম, যাকে ডোবানো দরকার তাকে ডোবাতাম। এইজন্যেই একটু ফন্দী আঁটতাম।

যমরাজা—পিতা-মাতাকে খেতে পরতে দিসনি কেন?

৺অবিনাশ— আজ্ঞে, বাপ-মা ভারী পাজী ছিলেন।

যমরাজা—চোপরও স্কাউণ্ড্রেল! জবাব দে অপর নারীর প্রতি লালসা ছিল কেন?

৺অবিনাশ—আজ্ঞে, স্ত্রী দিনরাত ঝগড়া করত আর বাড়ীতে ঢুকলেই অশান্তি; তাই বাইরের মেয়েদের নিয়ে একটু—

যমরাজা—লক্ষাধিক লোকের সামনে এই কথা বলতে তোর সঙ্কোচ হচ্ছে না? তাছাড়া শনিবার এলেই ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে অশ্বের 'নামৈবকেবলম্'। কি বল্?

৺অবিনাশ—ঘোড়দৌড়ের মাঠে এমন একটা থ্রিল আছে মাই লর্ড, যে একবার আরম্ভ করলে আর ছাড়া যায় না।

যমরাজ—তুই এত অসভ্য?

৺অবিনাশ—আজ্ঞে, আমার দোষটুকুই দেখলেন! জানেন, এক সাহেব আমার গুণে এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়েছিল।

যমরাজ—তুই কি সেই সাহেবের চোখের জল হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশিতে পুরে রেখেছিস?

৺অবিনাশ মাথা হেঁট করলেন।

যমরাজ—মদ্যপানে এত আসক্তি ছিল কেন?

৺অবিনাশ—আজ্ঞে, একটু নেশা টেশা না করলে কি পুরুষমানুষের চলে? দুখ-কষ্ট ভুলে থাকার জন্যই একটু মদ খেতাম।

যমরাজ—রাত্রে মদ্যপান করে স্ত্রীকে প্রহার করতি কেন?

৺অবিনাশ—সে কি আর জ্ঞানে পেটাতাম। একটু দিশি কারণ খেয়ে কি

যে করতাম কিছুই খেয়াল থাকত না। ভোরবেলা ভগবানের নাম নিয়ে উঠে দেখতাম বৌ-এর মাথায় ব্যাণ্ডেজ, ছেলের হাতে প্লাষ্টার, মায়ের মাথায় জলপটি। তখন খুবই লজ্জা করত মাই লর্ড!

যমরাজ—তোর এত গুণ!

৺অবিনাশ—সবই দ্রব্যগুণ মহারাজ! ঐ একনম্বর দিশি কারণই আমাকে দিয়ে এইসব করাত।

যমরাজ—মদ্যপান ছাড়া অন্য কোন নেশা ছিল?

৺অবিনাশ—শুধু পান আর সিগারেট। তাও যারা অফিসে নানা কাজ নিয়ে আসত তাদের ঘাড় ভেঙে—

যমরাজ—নিজে চুরি করে সাধাসিধে লোকদের চোর সাজাতি কেন?

৺অবিনাশ—আজ্ঞে, ওটুকু না করলে আর জীবনে কি করলাম!

যমরাজা জুরীদের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'১৫২-এ ধারা অনুযায়ী আমি এর শাস্তির বিধান দিলাম। এই ৺অবিনাশকে একটি বড় ডেকচিতে চাপিয়ে একবছর যাবৎ সেদ্ধ করা হোক। মেয়াদ শেষ হলে একে পৃথিবীতে আরশোলা হয়ে জন্মাতে হবে।'

চিত্রগুপ্ত আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—'মাই লর্ডশিপ্ এ্যাণ্ড জেণ্টলমেন অব দি জুরী! এবার আর এক বেয়াদপ এসেছে। নাম ৺বৈজুনাথ হনুমন্তিয়া। এ কলকাতার বড়বাজারে ব্যবসা করত। সব জিনিষে ভেজাল মিশিয়ে মানুষদের একেবারে পাগল করে দিত। আর এর প্রধান বিশেষত্ব ছিল খাদ্যে ভেজাল মেশাবার পরেই কালীঘাটে মা কালীর মন্দিরে গিয়ে পূজা দিত। লক্ষ লক্ষ কালোটাকা পৃথিবীতে রেখে এসেছে।'

৺বৈজুনাথ হনুমন্তিয়া কাঠগোড়ায় দাঁড়ালেন। যমরাজা হনুমন্তিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন,—'পাষণ্ড নরাধম বেশরম্! তুই এত পাজী?

৺বৈজুনাথ দু'হাতে নিজের কানধরে জিভ বার করে বললেন,

আরে ছিয়া ছিয়া ছিয়া! কুচ্ছুদোষ ত' হাম কিয়া নেই!

যমরাজ—চোপ রাস্কেল ননসেন্স ড্যাম ব্ল্যাডি! জানিস গুঁড়াদুধে ভেজাল মেশাবার জন্য কতো নিষ্পাপ শিশু মারা গেছে!

৺বৈজুনাথ—লেকিন ভেজালমে ত' বিষ ছিল না। হামি গুঁড়াদুধে আচ্ছা

ভেজাল দিয়েছে। আর যখুন খাটাল বানিয়েছিলুম, তখুন কর্পোরেশনের কল থেকে আচ্ছা পানী দিয়েছে।

যমরাজ—তবে অত শিশু মরল কেন?

৺বৈজুনাথ—বালবাচ্চাকো হামি মারিনি। ওরা নিজের মনে মরেছে।

যমরাজ—ভেজাল মিশ্রিত করে আবার পূজা দেওয়া হত?

৺বৈজুনাথ—ধরম্ ত' করতে হোবে!

যমরাজ—শয়তানি করে লোক মেরে পাঁচসিকের পূজা দিয়ে ধরম্? কি কি ব্যবসা ছিল?

৺বৈজুনাথ—জী কাপড়াকা হুকান, মশল্লাকা হুকান, গরু-ভঁইসকা খাটাল, টিনিয়া-দুধকা হোলসেল হুকান—এইসব বেওসা করিয়েছি।

যমরাজ—গো-মহিশের খাটাল থেকে যে দুধ পাওয়া যেত, তাতে ত' অর্ধেক জল মেশাতি?

৺বৈজুনাথ—জী হাঁ। লেকিন আচ্ছা পানী।

যমরাজ—টিনের দুধে কি কি ভেজাল মেশাতি?

৺বৈজুনাথ—টিনিয়া-দুধমে ফ্রেঞ্চ চক্‌কা গুঁড়া, চালকা গুঁড়া, আউর হরলিক্সমে ছাতু।

যমরাজ—নিজের স্ত্রীকে খুন করলি কেন?

৺বৈজুনাথ—জী, একটা একলাখ রূপেয়ার জয়েণ্ট লাইফ-ইনসিওর করেছিলাম। বেওসায় রূপেয়ার জরুরত হল। তাই জরুকে মেরে একলাখ রূপিয়া পেয়ে গেলাম। উস্‌কে বাদ ফিন সাদী করলাম।

যমরাজ—উঃ আমার মস্তিষ্ক ঝিমঝিম করছে। লোকটা একেবারে আপাদমস্তক শয়তান।

তারপর যমরাজা জুরীদের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'একে যে কি শাস্তি দেব ভেবেই পাচ্ছি না। প্রথমে এর চকচকে টাকে পাঁচটা সুপুরি বসিয়ে পাঁচজন লোক হাতুড়ীর ঘা দিক। তারপর প্রাসাদের বাইরে নিয়ে গিয়ে একটি গর্তে পুরে মাটি চাপা দিয়ে বেশ করে দুর্মুশ করে দিক। ছমাস এইভাবে রাখার পর একে মহিষরূপে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।'

জুরীরা একমত হলেন।

চিত্রগুপ্ত আবার উঠলেন,—'ইওর এক্সেলেন্সি এ্যাণ্ড জেন্টলমেন অব দি জুরী। এবার একজন মহিলার পালা। নাম—৺অরুণিমা পাল। এই রূপালাবণ্যবতী মহিলা বিবাহের পূর্ব্বে দু'জন ছেলেকে ঝিম্‌-ধরা আফিং খোরের মত কাবু করে ফেলে। তারপর আর একজনকে বিবাহ করে। বিবাহের পরেও অন্যত্র কেচ্ছা করেছে।'

৺অরুণিমা পাল কাঠগোড়ায় দাঁড়ালেন।

যমরাজা—তুই মানবী, না কুত্তী? বিবাহের পূর্ব্বেও অবৈধ সংসর্গ, বিবাহের পরেও তাই। কী ব্যাপার!

৺অরুণিমা—কে আর জানত যে মরার পরেও কৈফিয়ৎ দিতে হবে!

যমরাজা—চুপ কর্ নররাক্ষসী! বিবাহের পূর্ব্বে দুজনের মাথা খেয়েছিস? মিথ্যা বললে আরশোলা হয়ে জন্মাবি।

৺অরুণিমা—আজ্ঞে হ্যাঁ। দুজনকে ভাল বেসেছিলাম।

যমরাজ—তবে অন্যত্র বিবাহ করলি কেন?

৺অরুণিমা—আজ্ঞে, এর অবস্থা ভাল। এঁকে বিয়ে করলে ভাল খেতে পাব, পরতে পাব, তাই—

যমরাজ—বিবাহের পরে স্বামীর বন্ধুর জন্য ব্যাকুল হতি?

৺অরুণিমা—আজ্ঞে, উনি সারাদিন বাইরে থাকতেন। মাঝে মাঝে টুরে যেতেন, আমি একা একা সময় কাটাতে পারতাম না, তাই ওঁর বন্ধুর জন্য মন কেমন করত।

জুরীরা মুচকি মুচকি হাসছিলেন।

যমরাজ—তোর বিবেকে বাধে নি! পতি পরম গুরু আর তুই তারই অজান্তে অপরের সঙ্গে—

যমরাজা দাঁড়িয়ে বললেন,—'এই নির্লজ্জ মেয়েটির চোখে লঙ্কাবাঁটা ঘষে কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখ। ছমাস পরে ওকে আবার ল্যাটা মাছ হয়ে জন্মাতে হবে।'

জুরীরা একমত হলেন।

অতঃপর যমরাজা বললেন,—'আজ অনেক বেলা হয়ে গেছে। আবার কাল বিচার হবে।' তারপর উপস্থিত এক লক্ষ লোকের দিকে তাকিয়ে বলেন,—'তোরা

আহারালয়ে চলে যা। আহারালয়ের সামনের বাগানে গাছভরা আপেল, গাছ-ভরা আঙুর আছে। ভিতরে গব্যঘৃতে ভাজা লুচি, বাসি পায়েস, ছানা, রাবড়ী, সরভাজা, ক্ষীরের নাড়ু, আইসক্রীম সন্দেশ আরও কত কি আছে। আজ আহার সমাধা করে নিদ্রা যা। কাল আবার বিচার হবে।'

আমরা আহারালয়ে গেলাম। সুন্দর এক বাগানবাড়ী। তারই নাম আহারালয়। এই মনোরম বাড়ীর সামনে বাগানভরা আপেল আর আঙুরের গাছ। যেদিকে তাকাই সেদিকেই লাল টুকটুকে আপেল, আর থোকা থোকা আঙুর। একটি গাছপাকা আপেল ছিঁড়ে খেলাম। রসাল আপেলে যেই কামড় দিয়েছি, ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে রস গড়িয়ে পড়ল। দু'চারটে আঙুর খেলাম। একেবারে রসে টসটস করছে। আমার আশপাশ দিয়ে টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে যাচ্ছে। মাথার ওপর তাকাতেই দেখি কয়েকজন অপূর্ব্ব সুন্দরী ডানা-ওয়ালা পরী উড়ে গেল। সত্যি কী সুন্দর জায়গা।

আহারালয়ে সেদিন জনসমুদ্র হয়ে গেছিল। একজন বিশালবপু রাজকর্মচারী আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'যা তোরা ভেতরে যা। ওখানে খাবার আছে।' আমরা ভেতরে গেলাম। এমন অচিন্ত্যনীয় দৃশ্য আর দেখিনি। ভেতরের বিরাট হলঘর ভর্ত্তি খাবার। বিরাট চৌবাচ্চা ভরা রাবড়ী। চারিদিকে থরে থরে সাজানো কাঁচাগোল্লা, পান্তুয়া, রাজভোগ, সরভাজা, ক্ষীরমোহন, লুচি, আর অন্ততঃ হাজার রকমের ফল। ভাবলাম, প্রথমে লুচির ফোস্কা দিয়ে রাবড়ী খাব। এমন সময় এই বিশালবপু কর্মচারী আমাদের বললেন,—'হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? যত পারিস খেয়ে নে।'

এইকথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ বেধে গেল। ঠেলা-ঠেলি, মারামারি, গুঁতোগুঁতি করতে করতে কিছু লোক জখম হল। রাবড়ীর সেই পুকুরের মতো বড় চৌবাচ্চার চারদিকে উপুড় হয়ে পড়ে গোগ্রাসে রাবড়ী খেতে লাগল। দু'একজনের ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত রাবড়ীর মধ্যে ডুবে ছিল। আর কিছু লোক হাজার রকমের মিষ্টি আর ফলমূল এমনভাবে লোফালুফি করে খেতে লাগল যে বহু খাদ্য মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। যমরাজার সেই কর্মচারী আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'উঃ কী হাড়হাভাতে, জীবনে কিছু খেতে পাসনি?'

পরদিন ভোরবেলায় কোকিল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে রাজকর্ম্মচারীরা আমাদের

ঘাড় ধরে আবার যমরাজার হাইকোর্টে নিয়ে গেল। আবার যমরাজা সিংহাসনে বসলেন। জুরীরা বসলেন। চিত্রগুপ্ত সহকর্মীদের নিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। আমরা একলক্ষ লোক নিজ নিজ স্থানে বসলাম।

ধর্মরাজ হাতুড়া ঠুকলেন।

'চিত্রগুপ্ত উঠে দাঁড়িয়ে বলেন,—ইওর এক্সেলেন্সি এ্যাণ্ড জেণ্টলমেন অব দি জুরী! এবার এসেছে ৺গোবর্দ্ধন বড়াল। এই লোকটা কয়েকটি বড় বড় কারখানার ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট ছিল। এদিকে লোক ক্ষেপিয়ে বেড়াত, আর ওদিকে মালিকের কাছ থেকে মোটা ঘুষ নিত।'

যমরাজ খাতা দেখে ৺গোবর্দ্ধনের দিকে তাকিয়ে বললেন,—

উঃ কি চতুর! তুই কি জানতি না যে আমার খাতায় সব লেখা থাকে।

৺গোবর্দ্ধন—আজ্ঞে না।

যমরাজ—জনগণ ক্ষেপিয়ে বেড়াতি কেন?

৺গোবর্দ্ধন—ওই ত' ছিল আমার একমাত্র কাজ।

যমরাজ—লোক ক্ষেপিয়ে আবার মালিকের কাছ থেকে উৎকোচ নিতি কেন?

৺গোবর্দ্ধন—আজ্ঞে, ঘুষ পাওয়ার জন্য লোক ক্ষেপাতাম আর ক্ষ্যাপা দমাবার জন্য ঘুষ পেতাম।

যমরাজ—এতে তোর লাভ?

৺গোবর্দ্ধন—আজ্ঞে, লোক ক্ষেপালে একটু পপুলারিটি পাওয়া যায়, ইলেকশনে দাঁড়াবার সুবিধা হয়। তাছাড়া কারখানার লোক ক্ষেপিয়ে অচল অবস্থার সৃষ্টি করে একটু দক্ষিণা-টক্ষিণা নিয়ে আবার ক্ষ্যাপাদের শান্ত করে দিতাম। তাছাড়া এই আয়েই আমার সংসার চলত কি না?

যমরাজ—এই সরল বেয়াক্কেলে জনগণের মাথায় হাত বুলিয়ে জীবন কাটালি?

৺গোবর্দ্ধন—আজ্ঞে হ্যাঁ, মাই লর্ডশিপ!

যমরাজ—জনগণের কি লাভ হল?

৺গোবর্দ্ধন—ওদের আবার কি লাভ হবে? যেমন কিছু বোঝে না অথচ

কথায় কথায় হাত তোলে?

যমরাজ—উঃ কী অসভ্য? খাতায় দেখছি মালিকের কাছ থেকে মোট দশলাখ টাকা উৎকোচ নিয়েছিস। অত টাকা কি করেছিস?

৺গোবর্দ্ধন—আজ্ঞে, বিশেষ কিছু করতে পারিনি। একটা বাড়ী আর একটা গাড়ী করেছি। বাকী সব পার্টির জন্য আর ইলেকশনের সময় নিজের ঢ্যাঁড়া পেটাতেই খরচ হয়ে গেছে।

যমরাজ—কাউকে হত্যা করেছিস?

৺গোবর্দ্ধন—আজ্ঞে, পার্টির স্বার্থে কয়েকজনের লাশ হাওয়া করে দিয়েছি।

যমরাজ—তার মানে?

৺গোবর্দ্ধন—তার মানে ওদের মেরে ফেলে মাটিতে পুঁতে দিয়েছি। কাকে বকেও জানতে পারে নি। লোক দিয়েই খুন করেছি। আর লোকেরা যখন এসব হত্যাকাণ্ড করত, তখন ময়দানে দাঁড়িয়ে ফুলের মালা গলায় দিয়ে শহীদ দিবস পালন করতাম।

যমরাজ—মানুষ হয়ে মানুষের বুকে ছুরিকা বসাতে দ্বিধা হত না? সেই দামাল ছেলে বিবেকানন্দ এত প্রচার করে এল, 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'—এ সবের কিছুই শিখলি না?

৺গোবর্দ্ধন—ও সব নিয়ম উঠে গেছে।

এরপর যমরাজা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—'রাক্ষস-রাক্ষসীরা বহুদিন যাবৎ মাংসের কচুরী খেতে চাইছে। ৺গোবর্দ্ধনকে কুচিয়ে কিমা বানিয়ে সেই কিমার পুর দিয়ে কচুরী বানাও এবং রাক্ষস রাক্ষসীদের মধ্যে বিতরণ কর। হজম হয়ে গেলে ওকে ওরাং-ওটাং রূপে পৃথিবীতে পাঠাও।

একজন জুরী বলে উঠলেন,—'শুরুতে একটু জল বিছুটি দিলে হত না?

যমরাজা বললেন,—তথাস্তু।

চিত্রগুপ্ত দাঁড়িয়ে বললেন,—'মাই লর্ড! আর এক অসভ্য এসেছে। নাম ৺সুরেন সরখেল।'

৺সুরেন সরখেল কাঠগোড়ায় দাঁড়াতেই যমরাজ চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'এ ছোকরা কি করেছে?'

চিত্রগুপ্ত খাতা এগিয়ে দিলেন। যমরাজা খাতা দেখতে দেখতে লজ্জিত হলেন। তারপর ৺সুরেনের দিকে তাকিয়ে বললেন,—ছিঃ তোর এত অধঃপতন! রামমোহন-বিদ্যাসাগর-আশুতোষের দেশে জন্মে বি, এস, সি পরীক্ষায় বই খুলে নকল করছিলি?

৺সুরেন—আইজ্ঞা, আড্ডা মাইরা বছর কাটছে। জুতসই পড়া হয় নাই, তাই পরীক্ষায় টুকত্যাছিলাম।

যমরাজ খাতার দিকে তাকিয়ে বললেন,—অত হিন্দী সিনেমা দেখলে কি পড়ায় মনযোগ থাকে?

৺সুরেন—কইতেছিলাম কি! হিন্দী সিনেমায় বত্রিশ মজার ছড়াছড়ি, তাই বাজার থিকা পয়সা বাঁচাইয়া হিন্দী বায়োস্কোপ গ্যাখতাম।

যমরাজ—পরীক্ষায় নকল ধরার জন্য অধ্যাপককে প্রহার করলি কেন?

৺সুরেন—মাই লর্ড! আমি আপন মনেই টুকত্যাছিলাম। অধ্যাপকের কোন ক্ষতি হয় নাই। তয় তিনি ধরায়ে দিলেন ক্যান্?

যমরাজ—লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা রাস্কেল ডেপো! পরীক্ষার শেষেও ত' দেখছি আর এক অপকর্ম করেছিস?

৺সুরেন—কোন মাইয়া ছাওয়ালরে ভালবাসা কি পাপ?

যমরাজ—কিন্তু নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়াকে?

৺সুরেন—পিরীতির এই ত' রীতি পিরীত শুরু হৈলে কি কোন বাধা মানে?

যমরাজ—চোপ্। আত্মহত্যা করলি কেন?

৺সুরেন—আমার নিকট-আত্মীয়া বেবী আমারে বিয়া করবে বৈলা কথা দিছিলো। সেই আশাতেই রৈয়া ছিলাম। মাত্র সাতদিনের লাইগ্যা পুরীর সমুদ্দুর আর কোনারকের মন্দির দেইখ্যা ফিরা আইসা শুনি বেবীর বিয়া হৈয়া গেছে গিয়া। তখন ফলিডল খাইলাম।

যমরাজ—কি বেয়াক্কেলে! কি বেয়াদপ!

ধর্মরাজ যম বললেন—এই বেয়াক্কেলে ছেলেটিকে এক চৌবাচ্চা কার্বলিক এ্যাসিডের মধ্যে ছমাস চুবিয়ে রাখ। তারপর সুমতি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠাও।

সত্যব্রত রায়

চিত্রগুপ্ত আবার দাঁড়ালেন। যমরাজাকে বললেন, 'মাই লর্ড! কয়েকজন প্রায় নিরপরাধ লোক আছে। এরা বিশেষ কিছু অন্যায় করে নি।' যেমন একজন রিক্সাওয়ালা—৺মগনলাল। এ সারাজীবন শুধু লোকের বোঝাই বয়েছে। তারপর ৺হারাধন মাইতি। এ বেচারা কাট-ফাটা রোদে, হাড় কাঁপানো শীতে, বৃষ্টিতে ভিজে শুধু খোয়া ভেঙেছে। অথচ কোনদিন ভালকরে দুমুঠো খেতে পায়নি। তারপর ছেদীলাল—এ বেচারা এক বাড়ীতে ঝাঁটা লাথি খেয়ে আর দশ টাকা করে মাইনে পেয়ে চাকরের কাজ করে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছে। তারপর ধরুন—'

যমরাজ—আর শুনতে চাই না। এই রকম দুঃখী লোক যতজন আছে তাদের বড় বড় ধনীর ঘরে পাঠিয়ে দাও। যাতে ওরা সুখী হয়।

চিত্রগুপ্তের নির্দেশে কুড়ি-পচিশ জন দুঃখীলোক যমরাজাকে আভুমি প্রণাম জানিয়ে হর্ষপ্রকাশ করতে করতে চলে গেল।

চিত্রগুপ্ত বললেন,—ইওর এক্সেলেন্সি এ্যাণ্ড জেন্টলমেন অব দি জুরী। এবার আর এক ঘুঘুকে হাজির করছি। নাম ৺মদন বক্সা। এ লোকটা মন্ত্রী ছিল। দশবছর যাবৎ নানা দপ্তরের ভার নিয়ে মন্ত্রীত্ব করেছে। আর কত যে সম্পত্তি, বাড়ী, গাড়ী, ফ্যাক্টরী করে এসেছে তার ইয়ত্তা নেই। খাতাটা দেখুন :

যমরাজ খাতা দেখতে দেখতে চোখ কপালে তুলে ৺মদনকে বললেন,—দশ বছরেই সব কামাল করে দিলি?

৺মদন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

যমরাজ—এদিকে দেখছি মাত্র দুইশত টাকা গ্রহণ করে বাকী অংশ দান করতি। তবে এত কীর্ত্তি রেখে এলি কি করে?

৺মদন—আজ্ঞে মাইনে হিসাবে দু'শ টাকাই গ্রহণ করতাম বটে, কিন্তু অন্যদিকে মোটা আয় ছিল।

যমরাজ—কি প্রকারে?

৺মদন—আজ্ঞে, বড় বড় পারমিট, লাইসেন্স ইত্যাদির ব্যাপারে আমার হাত ছিল। তখন কিছু কিছু—

যমরাজ—জনগণের নেতা হয়ে, দেশের কর্ণধার হয়ে এসব টাকা নিতে লজ্জা করত না?

৺মদন—আজ্ঞে, আমি কারুর কাছেই হাত পাতিনি। সবাই বাড়ীতে এসে গোছা গোছা টাকা দিয়ে গেছে। আমি দয়া করে গ্রহণ করলে তারা ধন্য হত।

যমরাজ—ওফ্। পৃথিবীতে কতো সৎলোক আছে অথচ এ লোকটা কি অসৎ! যখন পুলিশ মন্ত্রী ছিলি, তখন লোকের ওপর অত্যাচার করেছিস?

৺মদন—আজ্ঞে, তেমন কিছু নয়। মাঝে মাঝে ক্ষিপ্ত জনগণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মৃদু লাঠিচালনা আর আলগোছে গুলি চালনার অর্ডার দিতাম

যমরাজ—মৃদু লাঠি চালনা! লাঠির আঘাত কি মৃদু হয়? আর আলগোছে গুলি চালনা?

৺মদন—আজ্ঞে, খবরের কাগজওয়ালারা ত' ঐ রকমই লিখত।

যমরাজ—লাঠিও মারতি আবার উৎকোচও নিতি?

৺মদন—বড় ভুল হয়ে গেছে মাই লর্ড! এখন সে ভুল বুঝতে পেরেছি।

যমরাজা বললেন,—৩০৯-এ ধারা অনুযায়ী ২৫ জন লাঠিয়ালকে ডেকে এর ওপর মৃদু লাঠি চালনা কর। তারপর শূলে চড়াও। শেষে কালোটাকায় যে কারখানা খুলেছে, সেই কারখানায় ঘাস কাটতে পাঠিয়ে দাও।

চিত্রগুপ্ত আবার দাঁড়ালেন,—মাই লর্ডশিপ, এবার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছেন এক মহিলা—নাম ৺রাত্রি গুহ। এই সুন্দরী মহিলা সমাজে অভিজাত রূপে পরিচিত ছিল। কিন্তু সমিতিতে যাওয়ার নাম করে, বক্তৃতা দেওয়ার নাম করে কলকাতার চৌরঙ্গীর নামকরা হোটেলে স্ট্রিপ-টিজের নাচ দেখাত।

যমরাজ—সে কিরূপ নৃত্য চিত্রগুপ্ত?

চিত্রগুপ্ত—আজ্ঞে, সেকথা শুনলে রাক্ষস রাক্ষসীরাও লজ্জায় লাল হয়ে যায়। ষ্ট্রিপ-টিজের নাচ মানে হলঘর ভর্তি লোকের সামনে সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন হয়ে ধেই ধেই নাচ।

যমরাজ লজ্জায় সিঁদুরের মতো লাল হয়ে উঠলেন। একজন বৃদ্ধ জুরী মুখের রেখাগুলি কুঞ্চিত করে বললেন,—'এ্যাঃ, ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা-থুঃ'

অপর জুরীরা লজ্জায় লাল হয়ে মাথা হেঁট করলেন।

সত্যব্রত রায়

৺রাত্রি গুপ্তর দিকে তাকিয়ে যমরাজ বললেন,—পোড়াকপালী নির্লজ্জে! লজ্জাই নারীর ভূষণ, আর তুই নারী হয়ে ওইভাবে দর্শককুলের সম্মুখে নৃত্য করতি? তোর লজ্জা করত না!

৺রাত্রি—লজ্জার কি আছে? প্রচুর টাকা পাওয়া যেত। সমাজের মাথাদের সঙ্গ পাওয়া যেত। প্রথম প্রথম একটু লজ্জা করত, তারপর ওসব সয়ে গেছিল। কারণ আমার যত এ্যারিষ্টক্র্যাসি,—তা তো এই দিয়েই!

যমরাজ—তোর বাড়ীর অন্য কোন প্রাণী একথা জানত না?

৺রাত্রি—স্বামী জানতেন।

যমরাজ—স্বামী জেনেও উৎসাহ দিত? সে ব্যাটা কোথায়?

৺রাত্রি—আজ্ঞে, তিনি এখনও পৃথিবীতে ফুর্ত্তি করছেন।

যমরাজ—ওর শাস্তি পরে দেব, এখন তোর শাস্তি দিচ্ছি।

তারপর যমরাজ জুরীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, মেয়েদের আমি আজও চিনতে পারলাম না। স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর কেউ চিনতে পারলেন না, আমি কি করে চিনব? পৃথিবীর কবিরাও স্ত্রী-চরিত্র সম্পর্কে বলেছে যে ওদের চরিত্র 'দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ?' যাক সে কথা। এই বজ্জাত নির্লজ্জে মেয়েকে একটি বড় কড়াইতে চাপিয়ে আড়াইমণ ফুটন্ত সরষের তেলে ভবছর ভাজো। তারপর ছাগল রূপে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও।

এমন সময় নন্দী ভৃঙ্গী ঝড়ের বেগে কোর্টের ভেতর ঢুকে যমরাজকে বললেন, —মহারাজ! সর্ব্বনাশ হয়েছে।'

যমরাজার সারা শরীর কেঁপে উঠল। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি হয়েছে নন্দী? কি দেখলে ভৃঙ্গী?

নন্দী-ভৃঙ্গী কাঁপতে কাঁপতে জবাব দিল,—একটি বিরাট উল্কা-পিণ্ড বেগে আমাদের রাজ্যে ছুটে আসছে।

যমরাজা চিত্রগুপ্তের দিকে তাকিয়ে বললেন,—চিত্রগুপ্ত, এখন উপায়!

বড় বড় রাজকর্মচারীদের মুখ শুকিয়ে গেল, নন্দী ও ভৃঙ্গী কেঁদে উঠল, আমরা বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে লাগলাম। যমরাজার মুখের কথা শেষ হতেই একটি বিরাট উল্কাপিণ্ড প্রচণ্ড বেগে প্রাসাদকে ধাক্কা মারল। আকাশ-ফাটানো শব্দে প্রাসাদ ভেঙে পড়তে লাগল। একটি মনুমেণ্টের সমান উঁচু স্তম্ভ আমার গায়ের

ওপর হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়তেই,—আমি খাট থেকে মেঝেয় পড়ে গেলাম

আরে! আমি এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলাম

সত্যব্রত রায়

আঞ্চলিক কবিতা প্রতিযোগিতা

'কণ্ঠভারতী' পত্রিকার বার্ষিক অধিবেশনে প্রস্তাব উঠল,—'আঞ্চলিক কবিতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?' কণ্ঠভারতী'র সম্পাদক শ্রীনচিকেতা ভড় বললেন,—'কথাটা ভেবে দেখবার মতো। ভাগীরথী-তীরের ভাষাই সব কিছু দখল করে আছে। কাজেই আঞ্চলিক ভাষাকেও মর্য্যাদা দিতে হবে।'

পত্রিকা কমিটীর অন্যতম সদস্য হিসাবে আমি বললাম—'আজ সত্যিই এ প্রস্তাব বিবেচনা করার সময় এসেছে। আঞ্চলিক ভাষায় লোকে কথা বলে, অথচ সে ভাষায় গল্প-কবিতা লেখা হয় না কেন? চাটগাঁয়ের লোক চাটগাঁয়ের ভাষায়, ঢাকার লোক ঢাকার ভাষায়, বাঁকুড়ার লোক বাঁকুড়ার ভাষায় নিশ্চয়ই কবিতা লিখবে আর তাইতো হওয়া উচিৎ।'

অপর এক সদস্য শ্রীদুর্লভ শিকদার বললেন,—'এ ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়ার জন্য অবিলম্বে 'আঞ্চলিক কবিতা প্রতিযোগিতা'র ব্যবস্থা করা হোক'।

সর্বশ্রী পরাণ কোলে, আশুতোষ আঢ্য, তিমির সেন, মঞ্জরী চক্রবর্তী এ প্রস্তাব মেনে নিলেন।

সম্পাদক মশাই বললেন,—'তা হলে এ প্রস্তাব মেনে নেওয়া হল। এখন টাকার সমস্যা। টাকার ব্যবস্থা হলেই যথাসম্ভব শীঘ্র প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হবে।

'কণ্ঠভারতী' পত্রিকার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রীকিষেণচাঁদ কংকোরিয়া বললেন,—'উ টাকার জন্য কি আসে? উ হামি দিয়ে দিব।' স্থানীয় এই বিশিষ্ট

১ম সুরকি ব্যবসায়ী শ্রীকাংকোরিয়া ৬'হাজার টাকা চাঁদা দিতে রাজী হলেন। আবার বৈঠকের আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

সম্পাদক শ্রীনচিকেতা ভড বললেন,—'আগামী ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জন্ম দিবসেই 'আঞ্চলিক কবিতা প্রতিযোগিতা'র ব্যবস্থা করা হবে। এই প্রতিযোগিতায় যে কোন অঞ্চলের কবি যোগদান করতে পারবেন। প্রতিযোগিতার শেষে বিজয়ী কবিকে পুরস্কৃত করা হবে।'

আমি বললাম,—'যে সব বিশিষ্ট কবি আঞ্চলিক ভাষায় কিছু লেখেন না, তাঁরা কি যোগদান করতে পারবেন না?'

মঞ্জরী দেবী বললেন,—'না। আঞ্চলিক ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্যই যখন এই প্রতিযোগিতা, তখন শুধুমাত্র আঞ্চলিক ভাষার কবিদেরই নেওয়া হবে।'

মঞ্জরী দেবীর কথায় আমি মরমে ম'রে গেলাম। তারপর সবিনয়ে নিবেদন করলাম—'হোক আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা। কিন্তু প্রতিযোগিতার বাইরেও দু'একজন কবিকে ত আনা যেতে পারে। যেমন ধরুন, বিশিষ্ট কবি শ্রীঅরবিন্দ সরখেল সম্প্রতি "দুটি টিউলিপস্, এক গুচ্ছ হাস্নাহেনা এবং তোমার মাথা" নামক কাব্যগ্রন্থের জন্য তারাপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন। তাছাড়া এঁর লেখা "দাং অষ্টবজ্র" কাব্যগ্রন্থটি নোবেল পুরস্কারের জন্য পাঠানো হচ্ছে। ওঁকে প্রধান অতিথি ক'রে আনলে কেমন হয়?'

মঞ্জরী দেবী বললেন,—'যদি আনতেই হয় ত' কবি মদন চোংদারকে আনুন। ওঁর লেখা "সুরঙ্গনা! ডবল ডেকারের নীচে আমি চাপা পড়ে গেছি" কাব্যগ্রন্থটি এবার এ্যাকাডেমি পুরস্কার পাবে শুনছি।'

সম্পাদক মশাই বললেন,—'এ্যাকাডেমি পুরস্কারই পাক আর যাই পাক, মহাকবি ভজহরি গুঁইকেই আমরা প্রধান অতিথি হিসাবে আনব।

শ্রীকাংকোরিয়া বললেন,—'হাঁ, উ এক-আদমি পুরস্কারে কি আছে? ভোজহরি বাবুকেই নিয়ে আসুন।'

অনেক উত্তপ্ত বাকযুদ্ধ হ'ল। অবশেষে সম্পাদক মশাই বললেন,—'শ্রী ভজহরি গুঁইকেই প্রধান অতিথি করা হবে। আগে ইনি কবিতা পাঠ করবেন। তারপর আঞ্চলিক কবিতা প্রতিযোগিতা শুরু হবে।

সর্ব্বাদিসম্মত ভাবে এ প্রস্তাব মেনে নেওয়া হল।

শ্রেষ্ঠ বাংলা দৈনিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল,—"কণ্ঠভারতী পত্রিকা গোষ্ঠী

আঞ্চলিক কবিতা প্রতিযোগিতার আহ্বান করেছে। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার যে কোন স্থানের অধিবাসী তাঁদের নিজ নিজ অঞ্চলের ভাষায় কবিতা রচনা করতে পারেন। বিজয়ী কবিকে প্রথম পুরস্কার ২০১ টাকা ও এক ডজন কবিতার বই উপহার দেওয়া হবে।"

অবশেষে সেই বহু প্রতীক্ষিত দিনটি এল। মাত্র দশ বারজন কবি এ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন। তবে দর্শক হয়েছিল প্রচুর। শ্রীকিষেণচাঁদ কংকোরিয়ার বাড়ীর সামনের মাঠে বিরাট প্যাণ্ডেল খাটান হল। প্যাণ্ডেলের ভিতর খুব সুন্দর করে সাজান হল। একটু উঁচু মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের ছবি সুন্দর করে সাজান হল। মঞ্চের এক পাশে আমরা অর্থাৎ 'কণ্ঠভারতী' পত্রিকার পরিচালক গোষ্ঠী বিচারকের আসনে বসলাম। ঠিক ছিল মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কবিরা কবিতা পাঠ করবেন।

মঞ্চের সামনে এক হাজার আসন দর্শকে ভরে গেল। সীট না পেয়েও বহু লোক ভীড় ক'রে দাঁড়ালেন। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে এলেন মহাকবি ভজহরি গুঁই।

সভার কাজ শুরু হল। সভাপতি শ্রীকিষেণচাদ কংকোরিয়া মাইকের সামনে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—'আমি বেওসা করি, লেকচার ত' হামি জানে না। লেকিন কুছু ত' বলতে হবে।'

এমন সময় সম্পাদক নচিবাবু শ্রীকংকোরিয়ার কানে কানে বললেন,—'আপনি রবীন্দ্র কলার ওপর কিছু বলুন।'

শ্রীকংকোরিয়া তাঁর ভাষণে বললেন,—'কণ্ঠভারতী'র এডিটর হামাকে রবীন্দ্রকেলার উপর কুছু বলতে বলেছেন। হামি জীবনে বহু কেলা খেয়েছি,—চাঁপা কেলা, মর্তমান কেলা, সিঙ্গাপুরী কেলা—লেকিন রবীন্দ্র কেলা যে কি চিনিষ উতো হামি জানে না। উ কেলা আভিতক খাইনি, বলব কি করে? আজ হামি এখানেই লেকচার শেষ করিয়ে দিই। এখুন কোমপিটিশন শুরু হোক।'

শ্রীকংকোরিয়ার এই সংক্ষিপ্ত মধুর ভাষণ শেষ হওয়ার পর সম্পাদক শ্রীনচিকেতা ভড় ঘোষণা করলেন,—'আমাদের প্রতিযোগিতা একটু পরেই শুরু হবে। প্রথমে প্রধান অতিথি মহাকবি ভজহরি গুঁই আপনাদের কবিতা

পড়ে শোনাবেন। তারপর আঞ্চলিক কবিতা প্রতিযোগিতা শুরু হবে।'

সভা শ্রীগুঁইকে হাততালি দিয়ে সম্বর্ধনা জানাল। শ্রীগুঁই মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। ঘন কৃষ্ণবর্ণ বেঁটে মোটা ভদ্রলোক। মাথায় প্রশস্ত টাক। শ্রীভজহরি পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে পাঠ শুরু করলেন,

ভজহরি ভনে এবে শুন গৌড়জন
কলিযুগে ঘটিতেছে মস্তিষ্ক ভক্ষণ
কলিকালে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের বাড়া
বয়স্কদের এই দশা, সন্তান লক্ষ্মীছাড়া।
এবে শুন সারকথা গৌড়জন ভাই
এ্যারিষ্ট্রক্র্যাসির কাছে মরালিটি নাই;
মার্চেণ্ট অফিসেতে বিগবস্ সবে
(আহা! কত না সমৃদ্ধ সব অর্থে আসবে!)
'লেডী' কর্ম্মী সঙ্গে লয়ে প্রেমলীলা করে
আর সতীলক্ষ্মী স্ত্রী গৃহে লক্ষ্মীপূজা করে
অথবা আড়ালে গিয়ে ফিয়াসেকে ধরে
একের আড়ালে এক কত কেচ্ছা করে!
(ভয় কি! সন্তানাদি জমা আছে রামকৃষ্ণ মিশনে!)

মহাকবি ভজহরি গুঁই চুপ করলেন। হাততালিতে সভা ফেটে পড়ল। অনুরোধ আসতে লাগল,—'আর একখানা' 'আর একখানা'।

ভজহরি দ্বিরুক্তি না করে আর একটুকরো কাগজ বার করে পড়তে লাগলেন,—

মোর ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা শুন গৌড়জন
চতুর্দ্দিকে জ্বলিতেছে ধ্বংসের ইন্ধন!
ছাত্রী যায় কলেজেতে প্রণমি পিতায়
ছাত্রবন্ধু সঙ্গে লয়ে যায় সিনেমায়;
হিন্দী সিনেমায় দেখে ক্যাবারে নর্ত্তন
চুপে বলে 'ভালবাসি, শোন হারাধন'
এই নারী ভবিষ্যের লজ্জাবতী বধূ
ভাজা মাছটি উল্টাইয়া খায় নাই কভু!

চতুর্দ্দিকে মুখোশ পরা কিসের খানদান ?
শুধু বকবাজী, ফন্দীবাজী, পরচর্চ্চা-প্রাণ !
এখনো সময় আছে কর সংশোধন
নতুবা সত্যটিরে কলির পতন !

আবার সহর্ষ হাততালি। দর্শককুল নানা মন্তব্য ছুঁড়তে লাগলেন,—'বসে পড়ুন !' বসে পড়ুন !'—পাগল ! পাগল !'—দু'একজন ফাজিল ছেলে চিৎকার করে উঠল,—'আর দু'খানা !'

মহাকবি ভজহরি শুঁই বসে পড়লেন। কণ্ঠভারতীর সম্পাদক ঘোষণা করলেন,—'আপনারা দয়া করে চুপ করুন ! এবার আমাদের আঞ্চলিক কবিতা প্রতিযোগিতা শুরু হবে।"

আঞ্চলিক কবিরা তাঁদের চিহ্নিত স্থানে বসে ছিলেন। তাঁরা নানা অঞ্চলের লোক। পূর্ব্ববঙ্গের যশোহর জেলা, ঢাকা জেলা, মৈমনসিংহ জেলা, চট্টগ্রাম জেলা, পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূমের কবিরা এসেছেন।

সভাপতি মশাই প্রথমেই পূর্ববঙ্গের একজন কবি শ্রীমনতোষ মৈত্রকে ডাকলেন। শ্রীমৈত্র মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন,—'আমি এ্যাটা প্রেমের কবিতা আনিছি। আপনাগারে কেমন লাগবেনে জানিনে।'—এই কথা বলে শ্রীমৈত্র একটি কাগজ বের করে পাঠ শুরু করলেন,—

'নির্জন সংলাপ'

(জনমনুষ্যহীন বাঁশঝাড়ের সম্মুখে উপবিষ্ট প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমিক ঢাকা জেলার, প্রেমিকা যশোহরের। কাল—সন্ধ্যা)

প্রেমিক ॥ ছাখছ কেমন আকাশ জুইর‍্যা চাঁদ উঠছে
চাঁদের লগে জ্বলজ্বইল্যা তারা ফুটছে :
হালার জোনাকীর পাল মিটমিটাইয়া ঘুরতেয়াছে
চক্ষু মেইল্যা চাইয়া ছাখ, আসো আমার কাছে।

প্রেমিকা ॥ ছাগবানে সব পরে আগে বিয়ের কথাডা কও
দেখতি দেখতি কমিন দিয়ে অন্য কথায় যাও ?
ওসব গলা জাঁতানে বাকিয্য ছাড়ো আসল কথাডা কও
'পরে কবানে' বলার ছল শিকেয় তুলে থোও।

জাহাজডুবি

প্রেমিক ॥ কেডা তুমার মাথা খাইছে আমার জানা নেই
হালায় কুবুদ্ধি ছাওনের বেলা সব ব্যাটারে পাই।
চাঁদনি রাতে চুপি চুপি প্রেমের কথা জাগে
চিরডা কাল থাক তুমি আমার লগে লগে।
মধুর রাতে ছাহ কেমন দৃশ্য জমতেয়াছে
(তুমার) প্রেমের হরপৎ পান করতে পরাণ কাঁদতেয়াছে।

প্রেমিকা ॥ বিয়ে করলি চিরডা কাল কাছেই থাকপানে
সোয়ামীর গুষ্টি ক্যালায় থুয়ে যাবানে কনে?
ছাওয়াল পাল সামাল দিতি এমনেই মরবানে
বিয়ের পর যা খাওয়া তাইতো খাবানে।

প্রেমিক ॥ চুপ ছাও সরমা চক্ষু তুইলা ছাও
ক্যাম্নে তোমারে পামু ভাবি অন্তরে।

প্রেমিকা ॥ অত বড় বড় চক্ষু নিয়ে তুমি চাকোকানা
কথার মদি অন্য কথা, বেজায় সেয়ানা।
তুমি ঘুরতিছ ডালে নাগর, আমি ফিরতিছি পাতায়
মিঠে কথায় চিড়ে ভেজেনা, ভিজেও আসল কথায়।

প্রেমিক ॥ নারী হইয়া পাষাণ তুমি,—একি বিচিত্তির!

প্রেমিকা ॥ ও! বিয়ার কথাডা শুনেই মিংসের কপো চিত্তির!

আবার হাততালি। আবার দর্শককুল থেকে একের পর এক মন্তব্য ভেসে এল,—"ওরে সরে পড়"—"সরে পড়" "এ আবার কোন দেশী কবিতারে বাবা"—"ওরে কোত্থেকে আমদানী করলি রে বাবা." ইত্যাদি। সভায় এমন সোরগোল শুরু হল যে চার পাঁচ মিনিট ধরে আমরা হাত তুলে সবাইকে থামাবার চেষ্টা করলাম।

সত্যব্রত রায়

সম্পাদক নচিকেতা ভড় ঘোষণা করলেন,—'এবার আপনাদের কবিতা পড়ে শোনাবেন হাওড়া ও হুগলী সীমানার এক পল্লীকবি শ্রীএককড়ি কাঁড়াড়।'

শ্রীকাঁড়াড় একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। কারণ হাজার হাজার লোকের সামনে কবিতা পড়ার অভ্যাস তাঁর নেই। তিনি সুদূর পল্লীর নিভৃত গৃহকোণে কাব্য চর্চা করেন। যাই হোক, নিজেকে সামলে নিয়ে এককড়িবাবু শুরু করলেন,—

'প্রিয়তমেষু'

কদ্দিন আমি শুনেছি তোমার ঠেঙে
আমায় ছেঁড়ে বাঁচবেনে আর তুমি
খাবেনে আর বাঁধবে নেকো চুল
খোঁপায় দেবেনে কনকচাঁপা ফুল॥

চৈপরাত কষ্ট পেনু, পেনু না হালে পানি
সকাল গইড়ে ডকুর এল, তবুও এলেনি
ডাইড়ে ডাইড়ে ঠ্যাংখানি মোর ব্যথায় টলমল্
মনের ভিদ্‌রে ব্যায়লা বাজে, আর কোরোনে ছল্॥

—'ওরে বার করে দে'—'বাঃ কড়া জমেছে—'দূর হ হতভাগা' প্রভৃতি মন্তব্যে এককড়িবাবু মাঝপথেই কবিতা পাঠ বন্ধ করে দিলেন। সভায় অত্যন্ত চিৎকার শুরু হয়ে গেল।

সম্পাদকমশাই জোড়হাত করে বললেন,—'আপনারা দয়া করে চুপ করুন। এখনো বাঁকুড়া, বীরভূম, পাবনা, মৈমনসিংহ ও চাট-গাঁয়ের কবিরা বসে আছেন।' আমরাও সকলকে শান্ত হতে অনুরোধ করলাম।

কয়েক মিনিট পরে সভার উত্তাপ একটু শান্ত হল। নচিকেতাবাবু ঘোষণা করলেন,—'এবার মৈমনসিংহের কবি কর্পূর চক্রবর্তী কবিতা শোনাবেন।' কবি কর্পূর কবিতা পাঠ শুরু করলেন,—

'বেবীসোনা'

আইয়া পড়ছস্ বেবীসোনা
কলজ্যা ফাইট্যা যায়,

জাহাজডুবি

ষৈবন কাইন্দ্যা আছাড় পরছে
তর ওই রাঙ্গা পায়
তরে স্থাখলে পরাণডার
এ্যাম্‌নে দশা হয়
য্যান কড়াইভরা গরম ঘির্‌তে
লুচি চটুপটায়॥

অট্টহাসিতে সভা ফেটে পড়ল। মোটা গলার হো-হো হাসি, সরু গলার খিলখিল হাসিতে সভা সরগরম হয়ে উঠল। মনে হল হাসির বন্যায় সব আয়োজন ভেসে যাবে। আমরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে সবাইকে শান্ত হতে বারবার অনুরোধ করলাম।

সভার আবহাওয়া অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে আসার পর সম্পাদকমশাই ঘোষণা করলেন,—'এবার আপনাদের কবিতা শোনাবেন চটগ্রামের কবি শ্রীনাড়ুগোপাল চৌধুরী। কিন্তু ওই ভাষা আপনারা সকলে হয়ত বুঝতে পারবেন না। তাই চাট-গাঁয়ের বাংলা থেকে সুললিত বাংলায় অনুবাদ করে শোনাবেন যশোহরের বিখ্যাত কবি শ্রীহরেকৃষ্ণ জোয়ারদার।'

দুই কবিই মাইকের সামনে দাঁড়ালেন। চাট-গাঁয়ের কবি নাড়ুগোপাল শুরু করলেন,—

'বিরিঞ্চির বিয়ে'

নহাস্তরে মায়াপোয়াল্‌ তোঁয়ারার কথা কই
বিরিঞ্চির বিয়্যার মৈধ্যে এ্যাক্‌কান ফোয়াস্থা কথা কই
হন্দি যাইয়োম্‌ না ঐন্দি যাইয়োম
বাজনাবাজির আওয়াজ শুন্‌ম্‌
মাইওরিতে কজ্জা ফাটুগে নোয়াবদি কই?

যশোরের কবির সুললিত বাংলা অনুবাদ—

আর হাঁসুকা না মিয়ামানষির পাল, তোমাগারে কই
আজ বিরিঞ্চির বিয়ের মদি এ্যাক্‌খেন খাঁটি কথা কই

ইদিক যাব না উদিক যাব
বাজনাবাজির আওয়াজ শোনবো
কুটুমির ঠ্যালায় কল্‌দে ফাটে, নোতুন-বৌদি কই ?

ভিড়ের পিছনে প্রচণ্ড বোমা পড়ল। সহস্রাধিক দর্শক রোমাঞ্চিত হলেন। আমরা সকলে মঞ্চে দাঁড়িয়ে দুইহাত তুলে গোলমাল থামাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কে কার কথা শোনে ? উত্তপ্ত সভা থেকে চিৎকার ভেসে এল—'বন্ধ করুন বন্ধ করুন'—'এমন ছাইভস্মের আয়োজন কে করতে বলেছে ?'

সভার আবহাওয়া এত উত্তপ্ত হয়ে উঠল যে বাধ্য হয়ে আমরা প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দিলাম। আমরা কেবল পণ্ডশ্রম করলাম। শুধু শুধু বোমা ফাটল, চেয়ার ভাঙল, প্যাণ্ডেলের কাপড় ছিঁড়ল। আঞ্চলিক কবিরা কোনরকমে পালিয়ে বাঁচলেন। আঞ্চলিক কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

সভা পণ্ড হওয়ায় কোন কবিকেই পুরস্কার দেওয়া যায়নি। পুরস্কারের ২০১ এবং একডজন কবিতার বই এখনো আমাদের কাছে আছে। এখন আপনারাই বিচার করে জানিয়ে দিন কোন কবিকে এই পুরস্কার দেওয়া যায় ?

জাহাজডুবি

কানে বিড়ি, মুখে পান
লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান।'

—জনসাধারণকে রাজনীতি নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠতে দেখলেই ছক্কাদা এই মন্তব্য করতেন। জনসাধারণকে তিনি বলতেন,—'পাবলিক'। কোন গণ্ডগোল, হৈ-চৈ শুনলেই ছক্কাদা বলতেন,—'পাবলিকের কথা বলিস নি। পাবলিকের যে কবে বুদ্ধিশুদ্ধি হবে!'

ছক্কাদার সঙ্গে যখনই দেখা হয় শুধু পাবলিক আর পাবলিক। পাবলিক সম্পর্কে ছক্কাদাকে একজন বিশেষজ্ঞ বলা যায়। ছক্কাদার মুখে পাবলিক বিষয়ে যা দু' চারটে গল্প শুনেছি তাই আপনাদের বলব।

আমাদের ছক্কাদা—শ্রীছক্কা পাঁজার ভাল নাম হয়ত একটা আছে। কিন্তু পাড়ায়, অফিসে, চায়ের দোকানে তিনি ছক্কা নামেই পরিচিত। ছক্কা নামের ইতিহাসও একটু শুনিয়ে দিই।

ছক্কাদার বাবা শ্রীপরাণ পাঁজা যৌবনে একদিন লুডো খেলছিলেন। লুডোর দান ফেলে চিৎকার করে উঠলেন,—'ছক্কা'! এমন সময় একজন ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে খবর দিল,—'পরাণদা, আপনার ছেলে হয়েছে। তখন পরাণবাবু ছেলের নাম রাখলেন ছক্কা—আমাদের ছক্কাদা—শ্রীছক্কা পাঁজা।

'ছক্কাদা, পাবলিক সম্পর্কে আপনি এত সজাগ কেন?'—একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

উত্তরে ছক্কাদা বললেন,—'তবে একটা গল্প শোন। তোরা ত' আমাকে

সত্যব্রত রায়

জানিস। সামান্য বেতনে কেরানীগিরি করি। কোন সাতে-পাঁচে থাকি না খাটি, খাই আর ভগবানের নাম করি। অথচ দুর্বিপাক আর কাকে বলে!'

—'কি রকম!'

—'শোন তবে। চাকরীতে ঢোকার পর প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে বাড়ী ফিরছি। ফেরার পথে ভাবলাম, মাইনে যখন পেয়েছি, কিছু খাওয়া যাক। এসপ্লানেডের মাঠে হিন্দুস্থানীরা খুব সুন্দর সুন্দর ফুচকা তৈরী করে। ভাবলাম, আবার শৈশবে ফিরে যাই। পেটে যতটা আটল ফুচকা খেলাম। খাওয়ার পর মাইনের খাম থেকে দু' টাকার নোট ফুচকাওয়ালাকে দিলাম। খামটা পকেটে রাখলাম। সামান্য কটা খুচরো পয়সা ফেরৎ নিয়ে প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখি, মাইনের খাম নেই। ডানদিকে মুখ ফেরাতেই দেখি একটি বেঁটে লোক হনহন করে চলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম,—'চোর চোর'। লোকটা ভয় পেয়ে ছুটতে লাগল। আমি পেছন পেছন ছুটলাম। আমার চিৎকারে হাজারখানেক লোক ছুটে এসে আমাকেই ধরে ফেলল। দমাদম কিল, চড়, ঘুষি পড়তে লাগল মাথায়, মুখে, ঘাড়ে। আমি ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করতে চাইলাম। কিন্তু কে আমার কথা শোনে! মনের সুখে সবাই আমাকে পিটিয়ে ছাতু করে দিল।

আমাকে পেটাতে দেখে সেই ফুচকাওয়ালা ছুটে এসে বলল,—'হারে রাম রাম! হারে ছিয়া ছিয়া—এ বাবুকে মারলেন কেন? আরে এ বাবুর রূপেয়া লিয়ে উসরা আদমী ভেগেসে। উস্‌কো পাকাড়কে লিয়ে আসুন!'

পাবলিক লজ্জা পেল। এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে করতে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। আমি ঘাসের ওপর ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে সব দেখতে লাগলাম। চোঙা প্যাণ্ট পরা এক উঠতি যুবক আমাকে বলল—'একটু ভুল বোঝাবুঝির জন্য আপনাকে ঠেঙিয়ে ফ্ল্যাট করে দিলে: কিছু মনে করবেন না দাদা!' —এই কথা বলেই ছেলেটি বাস ধরতে ছুটল। ধীরে ধীরে ভিড় কমে এল। তখন দুইজন ফুচকাওয়ালা (একজন যে আমাকে প্রাণে বাঁচাল, আর একজন তার পাশের ফুচকাওয়ালা) পরস্পর কথা বলছে,—'ওক বাবুকো বহুৎ মার মারা।'

অপরজনের জবাব,—'উনকো মার খানা থা।'

ফাঁকা মাঠ। সবুজ ঘাসের ওপর আমি ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে আছি। আমার

জাহাজডুবি

নড়বার ক্ষমতা নেই। অনন্ত নীলাকাশের দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যাতারা গুনছি আর ভাবছি, আমার সারামাসের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের টাকা নিয়ে গেল, তার ওপর পিটিয়ে চলৎশক্তিহীন করে দিয়ে গেল। শুধু লাভের মধ্যে কয়েকটা ফুচকা পেটে পড়েছিল।'

ছক্কাদা থামলেন। আমাকে বললেন,—'বল্ তুই! এই পাবলিকের ওপর সিমপ্যাথি থাকে?'

ছক্কাদার গল্প শুনে আমি হাসব না কাঁদব ভেবে পেলাম না। সংক্ষেপে বললাম,—'তা ত' বটেই।'

•

ওই ঘটনার পর থেকেই ছক্কাদা পাবলিক সম্বন্ধে সদা-সতর্ক হয়ে উঠেছেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় অফিস থেকে ফেরার পথে হাওড়া ষ্টেশনে ছক্কাদার সঙ্গে দেখা। তখন সন্ধ্যা সাতটা। ঠিক আধঘণ্টা পরে ট্রেন ছাড়বে। একে একে অফিস-ফেরৎ লোকেরা প্লাটফর্মে ঢুকতে লাগলেন। ছক্কাদা বললেন,—পাবলিকের কি বুদ্ধিশুদ্ধি আছে রে! আধঘণ্টা পরে ট্রেন অথচ এমন ব্যস্ত হয়ে হাঁটছে যে মনে হচ্ছে, ট্রেন ফেল করবে।' এই কথা বলেই ছক্কাদা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—'দেখবি, পাবলিকের কেমন বুদ্ধি! তবে ছাখ্' এই বলেই ছক্কাদা প্লাটফমের ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছক্কাদার পেছনের লোকও ছুটতে লাগল,—তারপর তার পেছনের লোক,—তারপর তার পেছনে—এমনি করে মুহূর্তের মধ্যে শ'পাঁচেক লোক প্লাটফমের ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল। ছক্কাদা ড্রাইভারের কামরা পর্যন্ত ছুটে এসে থামলেন। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন,—'দেখলি! একেই বলে পাবলিক! আধঘণ্টা পরে ট্রেন, অথচ শালারা—'

আমি মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলতাম,—'ছক্কাদা, পাবলিক সম্বন্ধে একটা থিসিস লিখুন।'

ছক্কাদা বলতেন,—'নাঃ পাবলিক সম্বন্ধে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। পাবলিকের নাম শুনলে আমার গা ঘিনঘিন করে। লিখতে হয়, তোরা লিখিস।'

•

একদিন ছক্কাদার সঙ্গে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম। খাঁচার ভেতর এক বনমানুষ পায়ের ওপর পা দিয়ে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে আছে। গালে হাত দিয়ে যেন গভীর ভাবে কি চিন্তা করছে। ছক্কাদা বললেন,—'পাবলিক যখন

বনমানুষ ছিল, তখন বরং অনেক শান্তি ছিল। এখন অতিরিক্ত সভ্য হয়েছে কি না, তাই অসভ্যতার চুড়ান্ত চারদিকে।

আমি বললাম,—'নিশ্চয়ই।'

এমন সময় একদল মেয়ে কলকল করতে করতে খাঁচার সামনে এল। কিছু মেমসাহেব, কিছু বাঙালী মেয়ে আর কিছু পাঞ্জাবী ও গুজরাটি মেয়ে। মনে হল সকলেই কনভেন্টে পড়া এ্যারিষ্ট্রক্র্যাট মেয়ে। বেশভূষাও বিলিতি ধরনের। সুন্দর সুঠাম, আঁটসাঁট দেহে কেউ পরেছে আরও আঁটসাঁট জাঙ্গিয়া ও উর্ধাঙ্গে আঁটো গেঞ্জী। কেউ চোঙা ফুলপ্যান্ট, ওপরে ছোট সার্ট জাতীয় কিছু। কেউ বা হাফপ্যান্ট, তারওপর জেব্রার মতো ডোরাকাটা গেঞ্জী। ওরা সকলেই বনমানুষটার দিকে তাকিয়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করছে আর এ ওর গায়ে খিলখিল করে হেসে লুটিয়ে পড়ছে।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম ছক্কাদা তেরছাভাবে ওদের মধ্যেই এক অষ্টাদশী মেমসাহেবের দিকে তাকিয়ে আছেন। মেয়েটির গায়ের রঙ গোলাপী। আর গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে এই আঁটসাঁট গেঞ্জী ও প্যান্ট পরেছে। এই আবরণ গায়ের সঙ্গে মিশে অনেকটা নিরাবরণের রূপ দিয়েছে। ছক্কাদা তাঁর পুরু পাওয়ারের চশমা মুছলেন, আবার পরলেন। তারপর আমার কানে কানে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওই মেয়েটার গায়ে কোন পোষাক টোসাক?'

আমি খুব লজ্জা পেয়ে বললাম,—হ্যাঁ হ্যাঁ পরেছে, তবে গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে আঁট করে পরেছে কি না, তাই আপনি বুঝতে পারছেন না।'

ছক্কাদা আরও গম্ভীর হলেন। তারপর আমাকে বললেন,—'আজকাল মেয়ে পাবলিক কি এত অসভ্য রে! আবার বনমানুষের দিকে তাকিয়ে ফুরফুর করে ইংরিজি ছোটাচ্ছে! বনমানুষ ওদের চেয়ে অনেক সভ্য।'

ছক্কাদার সেদিন খুব মন খারাপ হয়েছিল। সেদিন চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে বাসে হেদুয়ার পথ ধরলাম। বাসের মধ্যেও ছক্কাদা পাবলিক সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণ করলেন। পাঞ্জাবী কণ্ডাক্টর একজন বৃদ্ধ যাত্রীর কাছে টিকিট চাইলেন, —'টিকিট আপনা!'

বৃদ্ধ খেঁকিয়ে উঠলেন,—'দেব রে বাবা দেব। দেব না ত' কি অমনি যাব?'

আর একজন বৃদ্ধ বললেন,—'টিকিট চেয়ে কি অন্যায়টা করেছে?'

ব্যস, লেগে গেল তুমুল ঝগড়া। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসের যাত্রীদের ভেতর

দুইভাগ হয়ে গেল। উভয়পক্ষেই সাংঘাতিক ঝগড়া। বাস হু-হু করে ছুটতে লাগল। যাদের নিয়ে ঝগড়ার সূত্রপাত—অর্থাৎ সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী—নিজেদের গন্তব্যস্থলে নেমে গেলেন। কিন্তু ঝগড়া আর থামে না। তাঁরা যাওয়ার আগে যে দুইপক্ষ বাসে রেখে গেলেন, সেই দুই পক্ষই তাঁদের আরব্ধ কর্ম করতে লাগলেন। ছক্কাদা আমাকে বললেন,—'ত্থাখ একেই বলে পাবলিক। যে দুজনের ঝগড়া, তারা কোনকালে নেমে গেল অথচ শালারা—'

চিড়িয়াখানা থেকে ফিরে এসে হেডুয়ার মোড়ে এক রেষ্টুরেন্টে এসে বসলাম। সেটা ১৯৬৫ সাল। তখন ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ চলছে। রেষ্টুরেন্টে চা খেতে খেতে রেডিয়োতে শুনলাম সাবধান বাণী,—যখনই আপনারা সাইরেন বাজার শব্দ শুনতে পাবেন, তখনই যাঁরা পথে আছেন, বুকটা একটু উঁচু করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বেন। বুকটা উঁচু করলে বোমার আঘাত ততটা প্রচণ্ড নাও হতে পারে ইত্যাদি।

আমি আর ছক্কাদা সবে বিস্কুটে কামড় দিয়েছি। এমন সময় সত্যিই সাইরেন বেজে উঠল। তবে আসল সাইরেন নয়, পরীক্ষা মূলকভাবে বাজানো হচ্ছিল। প্রিয় পাঠক, বিশ্বাস করুন, সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিড়ির দোকানের সামনে আড্ডায় মশগুল সাত-আটজন ছেলে রাস্তায় উপুড় হয়ে শুয়ে বুকটা একটু উঁচু করে ধরল। তাদের ওই অবস্থা দেখে একের পর এক, কমপক্ষে এক হাজার লোক, যে যেখানে ছিল, রাস্তায় উপুড় হয়ে শুয়ে বুকটা একটু উঁচু করে ধরল।

আর ছক্কাদা! তিনি আর একটি বিস্কুট মুখে দিয়ে দার্শনিকের মতো নির্লিপ্তভাবে চিবোতে চিবোতে বললেন,—'দেখলি ত' পাবলিক কাকে বলে!'

সেদিন সন্ধ্যায় ছক্কাদার বাড়ীতে চা আর খোশগল্প শুরু হল। ছক্কাদা আমাকে বললেন,—'পাবলিক সম্বন্ধে কত আর বলব, তুই গন্ধর্ব সিং-এর সেই বিখ্যাত গল্পটা শুনিস নি?'

লজ্জায় মাথা হেঁট করে বললাম,—'না।'

'শোন্ তাহলে'—এই বলে ছক্কাদা বহু প্রচলিত সেই বিখ্যাত গল্পটা শুরু করলেন,—একবার এক ধোপা হনুমান সিং তার তাগড়াই গোঁফজোড়া কামিয়ে ফেলল। সেই ধোপার বন্ধু চোমরাও সিং তাই দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা

সত্যব্রত রায়

করল,—'ভাই হনুমান ! তোর সারাজীবনের সাধনার ধন গোঁফ-জোড়া কামালি কেন ?'

হনুমান সিং কাঁদতে কাঁদতে বলল,—'দুঃখের কথা আর কি বলব ভাই! গন্ধর্ব সিং মারা গেছে। তাই গোঁফ কামিয়েছি।'

তাই শুনে চোম্‌রাও সিং চোখের জলে ভাসতে ভাসতে তার গোঁফ-জোড়া কামিয়ে ফেলল। একদিন পর চোম্‌রাও-এর বন্ধু হোম্‌রাও সিং জিজ্ঞাসা করল, —'চোম্‌রাও ভাই। গোঁফ কামালি কেন ?' সেও একই উত্তর শুনল,—'গন্ধর্ব সিং মারা গেছে। অতঃপর হোম্‌রাও তার সাধের গোঁফ কামিয়ে ফেলল। হোম্‌রাও-এর মুখে গন্ধর্বের মৃত্যুসংবাদ শুনে তার বন্ধু সীয়ারাম ঝুনঝুনওয়ালা গোঁফ কামাল। এইভাবে গন্ধর্ব সিং-এর মৃত্যুসংবাদ দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। সারা দেশের লোক গুম্ফহীন হল। বাকী ছিলেন সেই দেশের রাজা আর মন্ত্রী। চারিদিকে খবর ছড়াতে ছড়াতে মন্ত্রীর কানে এল। মন্ত্রীমশাই শোকে মুহ্যমান হলেন। তারপর অশ্রুজলে স্নান করে গোঁফ কামিয়ে ফেললেন। মন্ত্রীর দেখাদেখি রাজাও গোঁফ কামালেন।'

'তারপর কি হল জানিস ?—তারপর গোঁফহীন রাজাকে দেখে রাণীর কি হাসি ! রাণী হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। রাজাকে বললেন, 'গোঁফ কামালে কেন গো।' রাজা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে জবাব দিলেন,—'গন্ধর্ব সিং মারা গেছে, তাই !' রাণীর কৌতুহল ফুরায় না। জিজ্ঞাসা করলেন,—'কে গন্ধর্ব সিং ?' রাজা আঙুল কামড়ে বললেন,—'তা তো জানি না। কে কোথায় আছ, মন্ত্রীকে ডাক।' রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'ওহে মন্ত্রী, কে এই গন্ধর্ব সিং ?' মন্ত্রী মাথায় হাত দিয়ে বললেন,—'তা ত জানি না ! ডাক অমুককে।' তারপর 'ডাক তমুককে...।' এমনভাবে রাজাময় ডাকাডাকি করে ধরা হল সীয়ারাম ঝুনঝুনওয়ালাকে, তারপর হোম্‌রাও সিং, চোম্‌রাও সিং। কিন্তু কেউ বলতে পারে না কে গন্ধর্ব সিং ? একেবারে শেষে সেই ধোপা হনুমান সিংকে পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়া হল রাজার কাছে। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন,—'কেন গোঁফ কামিয়েছিস রে ব্যাটা ?' ধোপা হনুমান সিং বলল—'গন্ধর্ব সিং মারা গেছে, তাই !'

রাজা চিৎকার করে উঠলেন,—'কে গন্ধর্ব সিং ?'

ধোপা করজোড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল,—'মহারাজ, আমার প্রিয় একটি

গাধা মারা গেছে। তারই নাম গন্ধর্ব সিং।'

অতঃপর রাজা বললেন,—'একটা গাধার জন্য দেশশুদ্ধ লোকের গোঁফ উধাও হয়ে গেল। এই ধোপাকে শূলে চড়াও।'

গল্প শেষ করে ছক্কাদা আমাকে বললেন,—'কেমন লাগল রে গল্পটা? বুঝলি ভাই! এরই নাম পাবলিক।'

আমি বললাম,—'খুব ভাল লেগেছে। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি পাবলিকের ওপর একটা থিসিস লিখবই।'

ছক্কাদা খুশী হয়ে আশীর্ব্বাদ করে বললেন,—'তোর একহাজার সন্তান হোক।'

সত্যব্রত রায়

শ্রীগন্ধর্ব চোংদারের আদি নিবাস হাওড়া জেলার আন্দুলে। শ্রীচোংদার একজন ব্যবসায়ী। সম্প্রতি তামাকের কলাও ব্যবসা করে তাঁর অর্থ উপচে পড়ছে। তিনি কলকাতার নিউ আলিপুরে রাজপ্রাসাদের মতো একটি অট্টালিকা নির্মাণ করেছেন। অর্থের ভারে সমাজে বিশিষ্ট হয়ে শ্রীচোংদার বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন। তিনিও এখন একজন বুদ্ধিজীবী হিসাবে সমাজে স্বীকৃতি পাচ্ছেন। সম্প্রতি 'ঘটি-বাঙাল' ভেদাভেদের অবসান করার জন্য 'নিখিল বঙ্গ তালগুড় সমিতি'র বার্ষিক অধিবেশনে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা' সব কাগজেই ফটোসহ ছাপা হয়েছে।

সে যাই হোক, শ্রীচোংদার তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান মুকুন্দ চোংদার বাবাজীবনের বিয়ের সম্বন্ধ পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ 'বাঙাল'দের ঘরেই দেবেন ঠিক করলেন। অনেক দেখাশুনা হল। অবশেষে অধুনা বালিগঞ্জ নিবাসী ঢাকার ভূতপূর্ব অধিবাসী শ্রীঅম্বুজ তলাপাত্রের একমাত্র কন্যা কুমারী দোলনচাঁপা তলাপাত্রের সঙ্গে ঠিক হল।

এই বিয়েতে শ্রীগন্ধর্ব চোংদার কি চেয়েছিলেন, শ্রীঅম্বুজ তলাপাত্র কি দিয়েছিলেন জানি না। তবে খুবই সমারোহে ধুমধাম করে যে বিয়ে হয়েছিল তা বলতে পারি। অন্ততঃ খাবারের তালিকা দেখে তা বলা যায়। ছ'শ লোক খেয়েছিল। ছটা ভিয়েন বসেছিল। খাবারের তালিকায় ছিল,—লুচি, নেই মাখান বেগুনভাজা, ছক্কা, ভেটকি মাছের ফ্রাই, মুড়িঘণ্ট, কাটলেট, রুইমাছের কালিয়া, চিংড়ির মালাইকারী, আনারসের চাটনি, ঠাণ্ডা দই, পেস্তা

থাবড়ানো সন্দেশ ইত্যাদি। খেয়ে সকলেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অনেকে বললেন,—'আহা! এমনটি আর হয় না' কিছুসংখ্যক বললেন,—'অপূর্ব খাইয়েছে। ফ্রাইটা যেন মুখে লেগে আছে।' কয়েকজন ভদ্রলোক বললেন, —'বাঃ শালার ব্যাটা শালা খুব খাইয়েছে।'

প্রীতিভোজের পালা শেষ হল। নিমন্ত্রিতেরা একে একে বিদায় নিলেন। ক্রমে রাত্রি বাড়ল। সরগরম বিয়ে-বাড়ী শান্ত হল। বরবধূ শ্রীমুকুন্দ চোংদার ও দোলনচাঁপা চোংদার (তলাপাত্র)-এর খাওয়া মিটল। ওদিকে মুকুন্দর ছোটবোন টুনটুনি-কেতকী-পাপড়ি, পাড়ার দু'জন বৌদি এবং আরও অনেকে ওদের ফুলশয্যার আয়োজন করতে গেল।

ফুলশয্যার ঘরটি সুন্দরভাবে সাজান হল। বিশাল স্প্রিং-এর খাট, তার ওপর রবারের ফেনা জমান গদি, বালিশ, জরির কাজ করা দামী ভেলভেটের চাদর বিছান আছে। চারিদিকে শুধু ফুল আর ফুল। রজনীগন্ধা, যুঁই, এ্যাস্টার, কস্‌মস্, টিউলিপস্—আরও কত কী! একদল মেয়ে খিলখিল করে হেসে এগিয়ে এল। সঙ্গে নীল বেনারসী পরা দুধে-আলতা দোলনচাঁপা আর হলুদ মটকার পাঞ্জাবী পরা গাঢ় জাম-রং শ্রীমুকুন্দ চোংদার। মেয়েরা নব পরিণীতা বর-বধূকে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন। পাড়ার বেবী-বৌদি বললেন,—'দেখো মুকুন্দ, খেয়ে ফেল না যেন!' মেয়েরা কলকল করে হেসে উঠল। মুকুন্দ দড়াম করে দরজায় খিল দিল। তবু আশঙ্কা গেল না। কে জানে আবার কে আড়ি পেতে থাকবে।

ঘরে দোলনচাঁপা একটা কৌচের ওপর বসল। মুকুন্দ দোলনচাঁপার হাত-দেড়েক দূরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রথমে কেউই কোন কথা বলল না। সম্ভবতঃ অপরিচয়ের জড়তা তারা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। মুকুন্দ একটা সিগারেট ধরাল, বার দুই ঘরময় পায়চারী করল; তারপর আবার খাটের ওপর বসল। আস্তে আস্তে তাকাল দোলনচাঁপার দিকে। কি সুন্দর দোলনচাঁপা! একে দুধে-আলতা গায়ের রঙ, তারপর নীল বেনারসী পরে কি সুন্দর দেখাচ্ছে। মুকুন্দ ভাবল নিজের কথা। তার চেহারাও ত' সুন্দর, সুশ্রী, সুঠাম! কেবল গায়ের রঙই যা মিশমিশে কালো আর চড়া লাইটেই যা বার্নিশের মতো চকচক করছে। মৌন অবস্থায় দু'মিনিট কেটে গেল। আসন্ন মিলনের রোমাঞ্চে শ্রীমুকুন্দ চোংদারের দেহ-মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

অথচ দোলনচাঁপা মাথা নীচু করেই বসে আছে। মুকুন্দ আর পারল না। বলল,—'কি গো, কথা কইবে নি! চৈপরাত কি এমন চুপ মেরে বসে রইবে?'

দোলনচাঁপা কথা বলল না। মাথাটা আর একটু হেঁট করল।

মুকুন্দ আবার বলল,—মুখ তুলে চাইবে নি?

এবারও দোলন কথা বলল না। এমন অদ্ভুত ভাষায় অসঙ্কোচে কথা বলতে দে'খ একটু তেরছাভাবে কটমট করে মুকুন্দর দিকে তাকাল।

মুকুন্দর কাল মুখখানা লজ্জায় বেগুনী হয়ে গেল।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। মুকুন্দ আর একবার চেষ্টা করল। দোলনচাঁপার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল,—সাড়া দিবেনি? ডাঁইড়ে ডাঁইড়ে ত' আমার ঠ্যাং ব্যথা হয়ে গেল।

এতক্ষণে দোলনচাঁপা মুখ খুলল,—চুপ ত্থাও! সারাডা জীবন ধইর‍্যাই ত' কথা কমু। কিন্তু অখন শোনলে ত' লোকে হাঁসব।

দরজার বাইরে দূর থেকে ভেসে আসা শব্দের মতো সরু গলার খিলখিল আওয়াজ শোনা গেল। দোলনচাঁপা ও মুকুন্দ লজ্জায় লাল ও বেগুনী হয়ে গেল।

দোলনচাঁপা ভাবল তার স্বামীর ভাষা শুনেই হয়তো কেউ হেসে ফেলেছে। তাই সে মুকুন্দর দিকে তাকিয়ে বলল,—এ কোন ত্থাশি ভাষা তোমাগ? শুইন্যা আত্মারাম খাঁচা ছাইর‍্যা পলায়।

মুকুন্দও ক্রুদ্ধ হয়ে বলল,—তুমিই বা কার ঠেঙে এ ভাষা শিখলে? শুনলেই ভূত পাইলে যায়।

দোলনচাঁপা ক্রুদ্ধ হয়ে বলল,—বিয়া করনের সময় হুঁশ হয় নাই? আমাগ' ভাষা যদি তোমাগ' এতই অপছন্দ ত' বিয়া করল্যা ক্যান্?

মুকুন্দ বলল,—ত্থাখ দোলন! তোমরা বাঙাল, তাই হয়ত তোমাদের বুলিতে ঘটিরা খেই হাইরে ফ্যালে!

গর্জন করে উঠল দোলনচাঁপা,—ঘটির মিয়া নৈলেই ত পারতে! সারাডা জীবন ধইর‍্যা লগে লগে থাকত আর মিঠা বুলি ছারত!

—তোমার ঠেঙে এ ব্যবহার আশা করিনি দোলন!

—ক্যান আমারে বিয়া করলে? আমাগ' টাকা দেইখ্যা কি তোমাগ মাথার চাকা ঘুইর‍্যা গেছে?

—তা নয় দোলন! ট্যাকার তরে চ্যাকা ঘোরেনে। ঘুরেছে তোমার

রূপের তরে।

—আমাগ' সবকিছুই যখন তোমাগ' খারাপ লাগে তখন বিয়ার সম্বন্ধ করা উচিত হয় নাই!

—খারাপ লাগলে এত কাণ্ড করে বিয়ে হোতোনি। এমন করে ছ'মণ তেলও পুড়তো নি আর রাধিকাও নাচতো নি।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। বোধহয় দুজনেই ভাবছিল তাদের কথা। এ কি হল? যে দিনটিকে ঘিরে এতকাল ধরে দুজনে কত রোমান্টিক স্বপ্ন দেখেছে, কত রাত মিলনের কথা বিভোর হয়ে ভাবতে ভাবতে বিহ্বল হয়ে গেছে, সেই বহু প্রতীক্ষিত দিনটি আজ তাদের জীবনে এসেছে, অথচ এ কি হয়ে গেল! অনর্থক বাকযুদ্ধ করে সব রোমান্স নষ্ট হয়ে গেল। নাঃ আর তারা ঝগড়া করবে না। দুজনের মন আবার নরম হয়ে গেল।

মুকুন্দ একটা ঢেকুর তুলল। ভেটকি মাছের ফ্রাই আর সন্দেশের কড়া সেণ্ট একসঙ্গে ঠেলে উঠে গলায়-নাকে-কানে ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করল। দুহাত দিয়ে দুই কান চেপে ধরে নিজেকে ঠিক করে নিল মুকুন্দ।

মুকুন্দ দোলনচাঁপার দিকে তাকিয়ে নরম স্বরে বলল,—খচে যাচ্ছ কেন দোলন?

দোলনচাঁপা উত্তর দিল না। ডানহাত তুলে কপালের চুল ঠিক করল। হাতের পাঁচটি আঙুলেই সে আঙটী পরেছে। মুকুন্দ দেখল চড়া আলোয় সেগুলি ঝিকমিক করছে।

মুকুন্দ আবেগভরে বলল,—কি আঙুলেই আঙটী পরেছ দোলন?

দোলন বলল,—হেঁ পরছি। দু' একদিন বাদে খুইল্যা ফ্যালুম।

'দোলন আমার দোলন!' বলে মুকুন্দ তার ট্যাঁক থেকে একটি হীরের আঙটী বের করে বলল,—কি আঙুলেই ত' ভরা, এটা কি বুড়ো আঙুলে পইরে দেবো দোলন?

দোলন ডানহাতের অনামিকার আঙটী বাঁ হাতের অনামিকায় পরে ডানহাত মুকুন্দর সামনে তুলে ধরল। মুকুন্দ আঙটী পরিয়ে দিল। হীরের আঙটীর দিকে তাকিয়ে দোলনের মন এক অদ্ভুত মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তবু সে হাত সরিয়ে নিল। মুকুন্দ গভীর আবেগে আর একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল,—হাত সইরে নিলে কেন দোলন? কাছে আসবে নি!

দোলন কপটতার ভান করে বলল,—যাঃ ফাজিল কনেকার! বেয়াদপ কনেকার!

মুকুন্দ বলল,—আমার দোলন, আমার চাঁপা, কি সুন্দর তুমি? ভগবান তোমাকে কি দিয়ে গইড়্যেছে?

দোলন দেখল মুকুন্দ মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকে দেখছে। দোলন সলাজ হেসে বলল,—রাত বাড়ত্যাছে, শুইবা না?

মুকুন্দ—হ্যাঁ শোব, তুমি শোবেনি?

দোলনচাঁপা বাক্যব্যয় না করে খাটের ওপর উঠে পড়ল। মুকুন্দ আলো নিভিয়ে দিল। ঘরে সূচীভেদ্য অন্ধকার নেমে এল।

তখন রাত্রীর প্রায় শেষ যাম। চোংদার-ভিলা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। সেই নিশুতি রাতে দূরের আর এক বিয়ে-বাড়ী থেকে মাইকের গান ভেসে আসছে। 'লোফালুফি' ছায়াচিত্রের সুপার-হিট গান,—

চল লীলা / ইম্পালা / রেডী আছে
ছুটে এস / চেপে বস / লাজ কিসে?
তুমি আমি / কত ঢঙই / শিখেছি যে
আজ ছুটি / মুঠি মুঠি / 'লাভ' শুধু!
হোঃ হোঃ হোঃ—হিঃ হিঃ হিঃ—লালালা

মুকুন্দ বলল,—দোলন! শুনেছ কি হাইকেলাস গান! গান শুনে মন লচ্ছে তোমার কোলে চিরতরে হাইরে যাই।

এই কথা বলেই শ্রীমুকুন্দ চোংদার দোলনের মুখে একটি ছোট শব্দ করল। গভীর নিবিড় অন্ধকার ঘর থেকে নারীকণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এল,—'যাঃ ফাজিল কনেকার, বেয়াদপ কনেকার।'

———

মিস্টার ভাস্কর বঙ্গদর্শন

মিস্টার নিকোলায়েভিচ্ ভস্কি তাঁর জন্মভূমি সুদূর রাশিয়ায় বসে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ পারঙ্গম রূপে রাশিয়ায় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। অগাধ নিষ্ঠা ও প্রভূত পরিশ্রমের সঙ্গে মিষ্টার ভস্কি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যাবতীয় রচনা দীর্ঘদিন ধরে পড়াশুনা করেছেন। এক কথায় মিষ্টার ভস্কির ওপর বঙ্কিম চন্দ্রের প্রচণ্ড প্রভাব পড়েছে।

'চলন্তিকা সাহিত্য সংস্থা'র তরফ থেকে আমরা রাশিয়ার উক্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ রেখেছিলাম। মিষ্টার ভস্কি প্রতি চিঠিতেই তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশ দেখার অভিপ্রায় জানাচ্ছিলেন। তাই 'চলন্তিকা সাহিত্য সংস্থা'র পক্ষ থেকে আমরা সকল সদস্য একযোগে মিষ্টার নিকোলায়েভিচ্ ভস্কিকে দীর্ঘদিনের জন্য বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লিখলাম। মিঃ ভস্কি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

১লা সেপ্টেম্বর সকালে আমরা দমদম বিমানঘাঁটিতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা ও প্রায় এক কিলো ওজনের যুঁইফুলের মালা নিয়ে ভস্কিমশায়ের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার তখন কী আনন্দ! বঙ্কিম সাহিত্য বিশারদ মিষ্টার ভস্কি আমাদেরই নিমন্ত্রণে সুদূর রাশিয়া থেকে উড়তে উড়তে সোনার বাংলায় আসছেন।

সকাল সাড়ে সাতটায় একটি বিমান নামলো। পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক সৌম্যদর্শন মিষ্টার ভস্কি স্মিতমুখে নেমে এলেন। আমি তাঁর হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা

সত্যব্রত রায়

দিলাম। পাঁপড়ি চক্রবর্তী তাঁর গলায় যুঁইফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। আমরা সহাস্যে নমস্কার জানালাম। মিষ্টার ভস্কি প্রতিনমস্কার জানিয়ে প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে চারিদিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন,—'বন্দেমাতরম্।' তারপর হাতের রজনীগন্ধার গুচ্ছ শুঁকলেন, গলার মালার একপ্রান্ত চোখবুজে নাকের সঙ্গে লাগিয়ে বলে উঠলেন,—'বাঃ কী সুবাসিত পুষ্পস্তবক, কী নয়নস্নিগ্ধকর প্রশান্তদীপ্তিবিমণ্ডিত কুসুমদাম। কী আতরবিনিন্দিত অমরাবতী নিঃসৃত মাল্যসৌরভ।'

হঠাৎ একজন রাশিয়ানের মুখে এই বাংলা শুনে আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। একটু কৌতুক বোধ করলেও আমাদের মুখে চোখে বিস্ময়ের ঘোর ছিল। কিন্তু আমাদের সদস্যা পাঁপড়ি চক্রবর্তী তাঁর বিকট হাসি চাপবার জন্য মুখে হাতচাপা দিলেন, পারলেন না। জলতরঙ্গের শব্দে হাসি বেরিয়ে এল। পাঁপড়ি দেবীর হাসিতে বোধহয় একটু আহত হয়ে মিষ্টার ভস্কি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'এই কাংস্যক্রেংকারকণ্ঠী মহিলা কে?'

আমি বললাম,—'ইনি আমাদের 'চলন্তিকা'র এক সদস্যা পাঁপড়ি দেবী।'

মিষ্টার ভস্কি চুপ করলেন। আমরা সকলেই চুপ করলাম। সাহেবের জন্য আমরা ট্যাক্সি নিয়ে এসেছিলাম। আমি এবং মিঃ ভস্কি একটি ট্যাক্সিতে উঠলাম, বাকী চারজন আর একটি ট্যাক্সিতে উঠলেন, ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। দমদম ছেড়ে আসতে আসতে মিষ্টার ভস্কি চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। ওই অঞ্চল এখনও ফাঁকা ফাঁকা। গাছ-গাছড়া দেখতে পাওয়া যায়। ট্যাক্সি ছুটছে। মিষ্টার ভস্কি মমতাময় দৃষ্টি মেলে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে করতে বললেন,—'এই সেই 'সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং মলয়জশীতলাং' বঙ্গভূমি। কী সুন্দর!' —তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—'চাহিয়া দেখ। মধ্যে মধ্যে কোমল নবতৃণবিশিষ্ট ভূমি, আর সকুসুম পুষ্পবৃক্ষ সকল বিচিত্র পুষ্পপল্লবে শোভা পাইতেছে। দূর হইতে এই নয়নপ্রীতিকর বৃক্ষের বিবিধ বর্ণপল্লব ও সমুৎফুল্ল কুসুমদাম দেখিতে রমনীয় লাগে।"

উত্তরোত্তর আমার বিস্ময় বাড়তে লাগল। এই বঙ্কিম-সাহিত্য-বিশারদ রুশীয় ভদ্রলোক শেষপর্যন্ত বঙ্কিমী বাংলাকে কথ্যবাংলারূপে ব্যবহার করছেন। আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। মিঃ ভস্কিকে বললাম,—'এ আপনি কি বলছেন! এ আবার কেমন বাংলা, এইরকম বাংলায় ত কেউ কথা বলে না!"

মিষ্টার ভস্কি বিবর্ণমুখে বললেন,—'আপনার সকল বাক্য আমার কর্ণগোচর

জাহাজডুবি

হইতেছে, কিন্তু মর্মগোচর হইতেছে না। আমার অধর হইতে ত' সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমের বাংলা স্ফুরিত হইতেছে, কিন্তু আপনি হাস্যোদ্রেককারী বাংলায় বাক্যালাপ করিতেছেন।"

আমি অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম,—'শুনুন মিঃ ভস্কি, দুরকম বাংলা আছে—সাধু আর চলিত। আগে সাধুভাষাতে সবকিছু লেখা হত। আজকাল সাধুভাষার ব্যবহার কমে এসেছে। কলকাতার কথাভাষাই সাহিত্যের বাহন হয়েছে। আর কথাবার্তা বলার সময় চিরকালই কথ্যভাষা ব্যবহার করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও কথ্যবাংলায় কথা বলতেন।'

মিষ্টার ভস্কি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন,—'কিমাশ্চর্যম্! বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই-রূপ ভাষায় বাক্যালাপ করিতেন! এই তথ্য ত' ইতিপূর্বে শ্রুতিগোচর হয় নাই। এখন প্রতি পদক্ষেপেই আমি অস্বস্তি বোধ করিব। অপিচ, এইরূপ বঙ্গভাষা আমার বোধগম্য হইবে না।"

আমি বললাম,—'আপনি বিচলিত হবেন না মিষ্টার ভস্কি। আপনি বাংলায় সুপণ্ডিত, আপনার পক্ষে কথ্য বাংলা শিখতে মোটেই অসুবিধা হবে না। কয়েকদিন আমাদের সঙ্গে মিশলেই শিখে যাবেন।'

মিষ্টার ভস্কি বললেন,—'বঙ্গের এই পরিবর্তনের ইতিহাস রাশিয়ায় পড়ি নাই। আপনারাও পত্রে কিছু লেখেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, —'সাহেবরা পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।' নিষ্ঠার সহিত বঙ্গসাহিত্যের চর্চা করিয়াও আমার কি দুর্দশা।"

আমি লজ্জিত হলাম। বিমর্ষ মিষ্টার ভস্কিকে বললাম,—'কিছু মনে করবেন, ভুল হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে এ ভুল শোধরানোর চেষ্টা করব। আপাতত আপনি এই ভাষাতেই কথাবার্তা চালিয়ে যান। তবে আমি আপনাকে বলছি, আপনি কয়েকদিনের মধ্যেই কথ্যভাষা শিখতে পারেন।'

যথাসময়ে দুটি ট্যাক্সি এসে ছাতুবাবুর গলিতে ১৯ নং বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। আমি এই বাড়ীর ভাড়াটে। আমার বাইরের ঘরই 'চলন্তিকা সাহিত্য সংস্থা'র অফিস। ভস্কিসাহেবকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করে ঘরে বসালাম। বাকী সদস্যদের বললাম,—'আপনারা এখন বাড়ী যান। স্নান খাওয়া সেরে বিকালে আসবেন। ততক্ষণ ভস্কিসাহেব আহার এবং বিশ্রাম গ্রহণ করুন।' সকলে

বিদায় নিলেন।

হাতমুখ ধুয়ে পোষাক বদলে মিষ্টার ভস্কি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে নিয়ে ভিতরের একটি ঘরে সোফায় বসালাম। এ বাড়ীতে আমরা মোট চারজন প্রাণী। আমি, আমার স্ত্রী, শিশুপুত্র ও ভৃত্য পটলা। যাইহোক, সোফায় বসে মিষ্টার ভস্কি যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আমার স্ত্রী চা-বিস্কুট এবং কয়েকটি মিষ্টি নিয়ে এল। মিষ্টার ভস্কি আমার স্ত্রীকে নিরীক্ষণ করে বললেন,—'এই উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী পদ্মপলাশনয়নী তন্বী যুবতীই কি আপনার সহধর্ম্মিনী?'

আমার স্ত্রী রাশিয়ানের মুখে এই বাংলা শুনে চমকে গেলেন। আর একটু হলেই হাতের চা ও জলখাবার পড়ে যেত।

আমি গম্ভীর হয়ে মিষ্টার ভস্কিকে বললাম,—'হ্যাঁ, ইনিই আমার স্ত্রী।

মিষ্টার ভস্কি বললেন,—'সাধু সাধু!

আমার স্ত্রী ঘরের এককোণে গিয়ে বসলেন। মিষ্টার ভস্কি চা-বিস্কুট খেলেন। তারপর মিষ্টির দিকে তাকিয়ে বললেন,—'এ গুলি কি?

আমি বললাম,—'সামান্য কটা মিষ্টি।

মিষ্টার ভস্কি বললেন,—'ইহা কি মিষ্টান্ন? তারপর একটা জলভরা তালশাঁস সন্দেশ মুখে দিয়ে চোখবুঁজে আস্বাদন নিতে নিতে বললেন,—শুনিয়াছিলাম বাঙ্গালীর ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে রসনাই অত্যাধিক সজাগ, অদ্য দেখিতেছি তাহা মিথ্যা নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বেকার দুই একজন লেখকের কিছু পুস্তকে বাঙ্গালীর ভোজনের কথা পড়িয়াছি,—

কিসমিস তপ্ত ক্ষীরে দিল ভিজাইয়া।
পোস্তবীজ দুগ্ধসহ দিল পাকাইয়া॥

কিংবা সীতার বিবাহের ভোজনপর্ব্বে—

সোনার পরাতে লুচি কচুরি পুরিয়া।
লাখে লাখে পরিবেষ্টা চলিল ধাইয়া॥
মোটা মোটা মণ্ডা মতিচুর মনোহরা।
অতি মিঠা ক্ষীর পিঠা ছানা রসকরা॥
খাজা গজা জেলেপি নিখুতি খাসতলা
গোলাপি বরফি দিছে দরে টাকাতোলা॥

মিষ্টার ভস্কির মুখে এই আবৃত্তি শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম,—'সেকি মিষ্টার ভস্কি, আপনি এত জানেন? এসব পড়লেন কোথেকে?'

ভস্কিসাহেব হেসে বললেন,—'দুই চারিটা প্রাচীন বাংলা পুস্তক পাঠ করিয়াছি। যাহা হউক, অদ্য ভোজনের সময় আপনাদের বাঙ্গালীত্বের পরিচয় পাইব। একটি কথা, আমি নিরামিষাশী।'

আমি বললাম,—'আপনি রাশিয়ায় থাকেন অথচ নিরামিষ খান?'

মিষ্টার ভস্কি বললেন,—'পূর্বে গোমাংস, অশ্বমাংস, শূকরমাংস, মৎস্য ও বিবিধ অণ্ড খাইতাম। কিন্তু কিছুকাল হইল ঐ সকল পরিত্যাগ করিয়াছি। বর্তমানে সাত্ত্বিক দ্রব্যাদি আহার করি। কেবল অত্যধিক শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য কয়েক বোতল 'ভদ্‌কা' পান করি।'

আমি বললাম,—'সে ব্যবস্থা করা যাবে। 'ভদ্‌কা'র বদলে না হয় অন্য কিছু এনে দেব। আর দুপুরে খাওয়ার জন্য নিরামিষ খাদ্যেরই ব্যবস্থা করছি।'

মিষ্টার ভস্কি বললেন,—'সে যাহা হউক, আধুনিক কথা বাংলা শিখিব কি প্রকারে?'

আমি বললাম,—'আপনি ভাববেন না। আপনি শুধু বঙ্কিমচন্দ্র পড়েছেন, এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বইও পড়তে হবে। আজ আমি আপনার জন্য পঞ্চাশটা উল্লেখযোগ্য বই এনে দেব। এই সব বই পড়ুন, আর সকলের সঙ্গে গল্পগুজব করুন। সকলে কিভাবে কথা বলছে লক্ষ্য করুন। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মিষ্টার ভস্কিকে কথাগুলি বলে পাশের ঘরে গেলাম। আমার স্ত্রীও ঢুকলেন। আমার খেয়াল ছিল না যে পঞ্চব্যঞ্জন রান্নায় গৃহিনী খুব ক্লান্ত। যাইহোক, আমি বললাম,—'গেঞ্জীটা কেচে দেবে?' ক্লান্ত গৃহিনী ঝংকার দিয়ে বললেন, —'না, আমি সারাদিন অত খাটতে পারব না।' গৃহিনী রান্নাঘরে গেলেন। আমি নিঃশব্দে মিষ্টার ভস্কির কাছে এলাম। মিষ্টার ভস্কি বললেন,—'আপনাদের কি দাম্পত্যকলহ শুরু হইয়াছে? কিন্তু বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষে' নগেন্দ্র সূর্যমুখী সম্পর্কে বলিয়াছিল,—'সূর্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী।...দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিঃশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ ....' কিন্তু আপনার স্ত্রীর সহিত ত' ইহা

মিলিতেছে না :

আমি বললাম,—'একটু-আধটু ঝগড়া মাঝেমাঝেই হয়। উনি অবশ্য 'আপ্যায়িত করিতে কটুম্বিনী' নন, তবে 'প্রমোদে হর্ষ' এবং 'সংসারে সহায়' মাত্র।

দুপুরে আমার সাধ্যমত আহারের ব্যবস্থা করেছিলাম। মিস্টার ভক্কি খেয়ে পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলে আমাকে সাধুবাদ জানালেন। তারপর তাঁকে বাইরের ঘরে বিশ্রাম করতে দিয়ে আমি তাঁর জন্য বই কিনতে গেলাম। সাহেবই টাকা দিয়েছিলেন।

বিকালে নূতন নূতন অনেক বই কিনে নিয়ে এলাম। রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা, গীতবিতান, গীতাঞ্জলি, গল্পগুচ্ছ, চোখের বালি ও আরও কয়েকটি, তারাশঙ্কর-মাণিক-বিভূতিভূষণ থেকে হাল আমলের সাহিত্যিকদের উল্লেখযোগ্য বইও আনলাম। মিষ্টার ভক্কি বই দেখে খুশী হলেন। তারপরই একটি টেলিগ্রাম আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। শান্তিনিকেতন থেকে টেলিগ্রাম এসেছে। শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা খবরের কাগজে মিষ্টার ভক্কির আগমন ও অবস্থানের খবর পেয়ে নিমন্ত্রণ করেছে। মিষ্টার ভক্কি আমাকে বললেন,—'আগামীকল্যই যাইতে ইচ্ছা করি।'

বিকালে একে একে 'চলন্তিকা সাহিত্য সংস্থা'র সদস্য ও সদস্যারা এসে পড়লেন। শান্তিনিকেতন থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে শুনে সকলেই সোৎসাহে মিষ্টার ভক্কির আগামীকাল যাওয়ার ইচ্ছাকেই সমর্থন করল। অবশেষে ঠিক হল আমরা চারজন মিষ্টার ভক্কিকে নিয়ে কালই শান্তিনিকেতনে যাব।

পরদিন দুপুরে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হলাম। ছাত্রীরা আম্রকুঞ্জে আলপনা দিতে শুরু করল। ছাত্রছাত্রীরা পরদিন সকালে আম্রকুঞ্জে এক আন্তরিক ও অনাড়ম্বর উৎসবের আয়োজন করল। প্রচুর দর্শক হয়েছিল। মিষ্টার নিকোলায়েভিচ্ ভক্কি স্বদেশীয় পোষাকই পরেছিলেন। একজন ছাত্রী একটি হলুদ রঙের উত্তরীয় তাঁর কাঁধে ঝুলিয়ে দিলেন। আর একজন ছাত্রী তাঁর কপালে চন্দনতিলক এঁকে দিলেন। মিষ্টার ভক্কি বিশেষ পরিতৃপ্ত হয়ে প্রধান অতিথির আসনে বসলেন। এক যুবক রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইলেন—'কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই।' একজন যুবতী ছাত্রী গাইলেন,—'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' ইত্যাদি।

রবীন্দ্র সঙ্গীত শেষ হল। তারপর এক সুন্দরী ছাত্রী মিষ্টার নিকোলায়েভিচ্

ভক্সির উদ্দেশে প্রশস্তিবাচন পাঠ করলেন। প্রশস্তিবাচন শেষ হওয়ার পর মিষ্টার ভক্সি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরুদ্ধ হলেন। ভক্সিসাহেব দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন,—

সমবেত গৌরকান্তি ও কৃষ্ণবর্ণ ছাত্রবৃন্দ, কুন্দশুভ্র অবেণীবদ্ধা রুক্ষকেশা এবং মসীবর্ণা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা তন্বী ছাত্রীবৃন্দ!

অদ্য এই রৌদ্রকরোজ্জ্বল আম্রকুঞ্জতলে, কবীন্দ্র রবীন্দ্রের পদধূলিধন্য শান্তিনিকেতনের স্নিগ্ধছায়ে দণ্ডায়মান হইয়া হর্ষোৎফুল্ল হইতেছি। সুদূর মস্কোয় উপবিষ্ট হইয়া নিষ্ঠার সহিত বঙ্কিমের সাহিত্য পাঠ করিতে করিতে 'সুজলাং সুফলাং' বঙ্গদেশের কথা ভাবিতাম। এই নদ-নদীবিধৌত, নারিকেল-খর্জ্জুর বৃক্ষাদি সমন্বিত, লতাগুল্মবেষ্টিত বনবিটপী-আচ্ছাদিত বারিবিধৌত, সর্ব্বলোক-চিত্তরঞ্জিনি বিশ্ববিমোহিনী শ্যামশোভাময়ী বঙ্গদেশকে আমার প্রণাম।

মিষ্টার ভক্সি হাতজোড় করে বঙ্গভূমির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। সমবেত দর্শক বক্তৃতা শুনে থ' হয়ে গেলেন। মেয়েরা খিলখিল করে হেসে উঠল। মিষ্টার ভক্সি একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন,—

অয়ি অবলাবালা তরলমতি অস্থিরচিত্তা চঞ্চলমস্তিষ্কা আলুলায়িতকুন্তলা! আপনার আধিক্লিষ্ট মুখে নূপুরশিঞ্জনবিনিন্দিত হাস্যস্ফুরিত হইতেছে কেন?

মেয়েটি লজ্জায় মুখে কাপড়চাপা দিল। ভক্সিসাহেব আবার শুরু করলেন,—

গতকল্য শ্রুত হইলাম বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় কেহই বাক্যালাপ করে না। সাম্প্রতিক বঙ্গসাহিত্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করিবার জন্য পঞ্চাশৎ সংখ্যক পুস্তক ক্রয় করিয়াছি। পুস্তক পাঠপূর্ব্বক অভিজ্ঞতা জন্মাইলে আধুনিক বাংলায় ভাষণ প্রদান করিব। কবীন্দ্র রবীন্দ্রের নাম শুনিয়াছি কিন্তু তৎকৃত বাংলা অদ্যাপি পাঠ করি নাই। শীঘ্রই কলমুখরিত কলিকাতার 'ছাতুবাবুর গলি' মধ্যে বসিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্য অধ্যয়ন শুরু করিব। আপনাদিগকে আমার হৃদয়রস-অভিসিঞ্চিত অভিনন্দন জানাইলাম। অলমিতি বিস্তারেণ।

বক্তৃতা শেষ হল। যে শান্তিনিকেতনে হাততালির রেওয়াজ নেই, সেখানেও সহর্ষ হাততালিতে আম্রকুঞ্জ মুখরিত হল।

একজন ছাত্রী সমাপন সঙ্গীত গাইছিলেন,—

'আলোকের পথে, প্রভু, দাও দ্বার খুলে—
আলোক-পিয়াসী যারা আছে আঁখি তুলে,' —

সত্যব্রত রায়

তখনই একদল রাইফেলধারী পুলিশ প্যারেড মার্চ্চ করতে করতে আম্রকুঞ্জের পাশদিয়ে চলে গেলেন। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যই হয়ত পুলিশদল টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। মিষ্টার ভক্সি আশ্চর্য হয়ে এই দৃশ্য নিরীক্ষণ করলেন।

ছাতুবাবুর গলিতে ফিরে এসে মিষ্টার ভক্সি রবীন্দ্রসাগরে তলিয়ে গেলেন। তাঁকে দেখে মনে হল ক্ষ্যাপা যেন এতদিনে পরশপাথরের সন্ধান পেয়েছে। গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ প্রভৃতি পড়ে মুগ্ধ হলেন। আর প্রতিদিন 'চলন্তিকা'র সান্ধ্য আসরে সকলের সাথে গল্প করেন ও প্রত্যেকের কথ্যভাষা নোট করেন।

মিষ্টার ভক্সি মন্ত্রমুগ্ধের মত রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানা বই পড়লেন, শরৎ-সাহিত্যে মুগ্ধ হলেন। তারাশঙ্করের 'কবি', বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' পড়ে ব্যাকুল হলেন। একে একে উল্লেখযোগ্য সকল লেখকের বাছাই করা বইগুলি পড়ে ফেললেন।

এবার সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের পালা। একদিন দুপুরের ভোজপর্ব সেরে দেখি সাম্প্রতিক একটি রচনা পড়তে পড়তে মিঃ ভক্সি লজ্জায় সিঁদুরের মতো লাল হয়ে উঠেছেন। আমাকে বললেন,—'এ কি প্রকার বাংলা?' তারপর বই থেকে অংশবিশেষ পড়ে শোনালেন,—

'অসিত কাকুতি মিনতি করে কি বলতে যাচ্ছিল। সেই আওয়াজটা ধমক দিল, চোপ শালা, আবার কথা। মুখ খুলেছ কি বল বিয়ারিং ছটকে যাবে।' ..

'খাপরি মাল হাতে পেয়েছে তো, গুরু তাই একটু সফ্‌ট্‌ দিচ্ছে। চড়া আওয়াজে বলল, ফুল ফিটিংস্‌-এ যদি বাড়ী পৌছুতে চাও দিদিমণি, একদম আওয়াজ দেবে না।

ড্রাইভার ছোকরা হাসতে হাসতে বলল, ধুস্‌ শালা, একটা ঠিকরির লাথি খেয়েই আলুর দম। কোত্থেকে এই মদনাটাকে জোটালে গুরু! মাইরি বলছি শালা, বেশী বাতেলা মারিসনি, কোন সময় হেভি ঝাড় খেয়ে যাবি।' 'তলিয়ে যাবার আগে সে শেষ লড়াই শুরু করল। সে নড়েচড়ে তলপেট সরিয়ে সরিয়ে ছটফট করে যতরকমে পারে বাধা দিতে লাগল।'

মিষ্টার ভক্সি এই অংশগুলি শুনিয়ে আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি বললাম,—'মানে, এগুলো খুব শক্ত কব্জিতে বাস্তবজীবনের রূঢ় সত্যকে তুলে ধরেছে।'

জাহাজডুবি

মিষ্টার ভস্কি বললেন,—'সাহিত্যে এইরূপ ভাষার প্রবেশ, এইরূপ বে-আব্রু বর্ণনা,—এ যেন পবিত্র মন্দিরে অশুচির প্রবেশ।'

আমি বললাম,—'সেকি মিষ্টার ভস্কি! বুর্জোয়া সাহিত্যের দিন চলে গেছে। তাই বাস্তবজীবনের রূঢ় সত্যকে, সমাজের পরিষ্কার-নোংরা লোকদের মুখের ভাষা তুলে এনে সাহিত্যে ঢোকান হচ্ছে—একেই বলে গণসাহিত্য।'

মিষ্টার ভস্কি রেগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—'তাহা হইলে সভ্য হইবার কি প্রয়োজন ছিল? অরণ্যে গমন করিলেই হয়! বস্ত্রাচ্ছাদিত হইবারই বা প্রয়োজন কি? সাহিত্যে ঈদৃশ বর্ণনা,—এ যেন অস্পৃশ্যকে শয্যায় ঠাঁই দেওয়া।'

আমি বললাম,—'আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন মিঃ ভস্কি! জনগণ কি সাহিত্যে তাদের মুখের ভাষায় কথা বলবে না?* তারা গোচরে অগোচরে যা করে তা কি সাহিত্যে লেখা হবে না?'

উত্তেজিত হয়ে মিষ্টার ভস্কি বললেন,—'একটু ইঙ্গিত দিয়াই ত' নানারূপ বেয়াদপির কথা বলা যায়, অত পুঙ্খানুপঙ্খ ব্যাখ্যার প্রয়োজন কি? সকলের অগোচরে সকলেই মলত্যাগ করে, ওগুলিও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাসহযোগে সাহিত্যে ঢুকাইয়া দিন।'

মিষ্টার ভস্কি সেদিন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছিলেন। আমি বহু চেষ্টা করেও বোঝাতে পারলাম না যে এগুলি বাস্তবধর্মী গণসাহিত্য। আমি যতই প্রশংসা করি, উনি ততই মাথা নাড়েন। শেষ পর্যন্ত বললেন,—'এগুলি সাহিত্যই নহে। কিছুসংখ্যক নিষ্ঠাহীন আচারভ্রষ্ট লোকের সৌখিন মজদুরি, 'সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি!' বঙ্কিম-রবীন্দ্র ও তৎপরবর্তী সাহিত্যিকদের নিষ্ঠা বর্তমানের সাহিত্যিকরা কল্পনাও করিতে পারেন না।'

আমি দেখলাম ভস্কিসাহেব অত্যন্ত রেগে গেছেন। তাই আর কথা বাড়ালাম না। মিঃ ভস্কির সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনা সেদিনের মত শেষ করলাম।

* * *

মিষ্টার ভস্কির উত্তরোত্তর উন্নতি হতে লাগল। তিনি বাংলা সাহিত্যে অসীম জ্ঞানের অধিকারী হলেন। কিন্তু কথ্যভাষায় প্রচণ্ড গোলমাল করতে লাগলেন।

বঙ্কিমী ভাষায় সঙ্গে একেবারে হালকা ভাষা, হাওড়া-হুগলী ঢাকা জেলার ভাষা মিশিয়ে মশলাদার খিচুরী তৈরী করতে লাগলেন। এ আশঙ্কা আমার আগে থেকেই ছিল। কারণ আমাদের ছাতুবাবুর গলির 'চলন্তিকা সাহিত্য সংস্থা'য় ঢাকা-মৈমনসিং থেকে শুরু করে হাওড়া-হুগলী-বাঁকুড়া-বীরভূম সব জেলার লোকই আছেন। তাই আমি আশঙ্কিত হয়েছিলাম যে, প্রতিদিন সান্ধ্য সাহিত্যিক আড্ডায় সকলের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করে যদি মিষ্টার ভক্সি তাঁদের কথ্যভাষা আয়ত্ব করতে যান, তাহলে নিশ্চয়ই একটা কেলেঙ্কারী করে ফেলবেন! শেষ পর্যন্ত হলও তাই।

একদিন সন্ধ্যায় 'চলন্তিকা সাহিত্য সংস্থা'র আড্ডায় আমরা মোট পনের জন সদস্য ও পাঁচজন সদস্যা মিষ্টার ভক্সির সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করছিলাম। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী শ্রীনূপুরশিঞ্জন চোংদার মিষ্টার ভক্সিকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'হালের বাংলা সাহিত্য আপনার ভাল লাগছে নি?'

মিষ্টার ভক্সি বললেন,—'বঙ্কিম রবীন্দ্রই সর্বশ্রেষ্ঠ, শরৎ চন্দ্রও উত্তম, তৎপরবর্তী কয়েকজনের লেখাও চমৎকার! পূর্ব্বে সাধনা ছ্যালো, নিষ্ঠা ছ্যালো; কিন্তু সাম্প্রতিক ফাঁকিবাজ সাহিত্যিকদের ঠেঙে তাহা আশা করিতে পারি না।'

শ্রীধ্রুবজ্যোতি তা বললেন,—'হালে কত সুন্দর সাহিত্য রচনা করা হচ্ছে আপনি শোনেন নিকো?'

ভক্সিসাহেব বললেন,—'অদ্যাপি শুনিনিকো।'

কুমারী মঞ্জু ঘোষ দস্তিদার বললেন,—ব্যাপারডা হল অখন সাহিত্যে বাস্তবজীবনের ছায়া আইস্যা পড়ছে তাই হয়ত আপনাদের ভাল লাগে না।'

মিষ্টার ভক্সি বললেন,—'সাহিত্যের ধ্রুপদী আবেদনে আমি বিশ্বাস করি। বঙ্কিম-সাহিত্যের অমৃতধারায় পরিস্নাত হইয়াছি। রবীন্দ্রসাহিত্য সাগরে অবগাহন করিয়াছি। সুতরাং অখন ক্যামনে সাম্প্রতিক বঙ্গসাহিত্যের ফচ্‌কেমিতে প্রবেশ করি?'

শ্রীঅশনিসংকেত গুপ্ত বললেন,—'কইতেছিলাম কি, সম্প্রতি কিছু রচনা তো বঙ্গসাহিত্যের নূতন দিগন্ত উন্মোচন কইর্‍্যা দিত্যাছে। আপনের লগে সেই সব বই নাই?'

মিস্টার ভক্সি বললেন,—'নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হইতেছে! ঈদৃশ বাক্য কৈল কেডা?'

শ্রীনাড়ুগোপাল ধাড়া বললেন—'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে খুব টেকনিকের পরীক্ষা হচ্ছে, নূতন নূতন দিক দেখান হচ্ছে। নয় কি?'

ভস্কিসাহেব বললেন,—'এ জাতীয় অন্ধবিশ্বাস আপনাদের ঠেঙে আশা করি নাই। টেকনিক সর্বস্বতা আমার উত্তম লাগে না। তাহাছাড়া বলিবার কথা বোধকরি কমিয়া গিয়াছে। তাই বিদেশী সাহিত্য হইতে টেকনিক, বুলি ও রস আহরণ করা হইতেছে। তাহা করুক। কিন্তু আমার মনে হইতেছে কিছু অসুস্থ লোকের বিকৃত কল্পনাই বর্তমানের অধিকাংশ সাহিত্যের মূল।'

একটু চুপ করে মিষ্টার ভস্কি আবার তাঁর কথার রেশ টেনে বললেন,—'নাঃ আর ভাল লাগিতেছে না। ভাবিতেছি আবার রাশিয়ায় পাইলে যাই।'

আমার একটি প্রশ্নের উত্তরে মিষ্টার ভস্কি বললেন,—'কোথায় সেই বঙ্কিমের ভাষা—"জ্যোৎস্না এখন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকার মাখা—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত," কিংবা রবীন্দ্রনাথের—"এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে—প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলো কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়াছে"...

মিষ্টার ভস্কি এইটুকু শুনিয়ে বললেন,—'কোথায় এইরূপ ভাষা আর কোথায় "শালা বেশি বাতেলা মারিস নি, কোনসময় হেভি ঝাড় খেয়ে যাবি" জাতীয় ভাষা।'

আমি চট করে কোন উত্তর খুঁজে পেলাম না। হাঁ করে মিষ্টার ভস্কির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মিষ্টার নিকোলায়েভিচ্ ভস্কি খুব শীঘ্র চলে যেতে চাইছিলেন, আমাদের অনুরোধে দুর্গাপূজার কটা দিন থাকতে রাজী হলেন।

সারা কলকাতা আমরা মিষ্টার ভস্কিকে নিয়ে ঠাকুর দেখলাম। দুর্গাপূজার আড়ম্বর চাক্যচিক্য এবং সুন্দর সুন্দর ঠাকুর দেখে মিষ্টার ভস্কি মুগ্ধ হলেন। নূতন নূতন পোষাক পরা শিশু, তরুণ-তরুণী ও নানাবয়সের নারীপুরুষকে দেখে সাহেব প্রীত হলেন। ঠাকুর দেখে বাড়ীতে ফিরে এসে অকপটে স্বীকার করলেন,—'এইরূপ আন্তরিক ও আড়ম্বরপূর্ণ মহোৎসব বোধকরি জগতে নাই। কি অপূর্ব সব দেবীমূর্তি! পূজায় আলোকমালা সুশোভিতা নগরী দেখিলে কে বলিবে যে সংখ্যাহীন ভিক্ষুক চতুর্দ্দিকে আছে? মর্মরপ্রাসাদগুলির চাকচিক্য দেখিয়া কে বলিবে যে জীর্ণাচ্ছাদ কুটিরে মুমূর্ষু মানব মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে?

সত্যব্রত রায়

বিসর্জনের দিন মিষ্টার ভস্কিকে নিয়ে গঙ্গাতীরে গেলাম। প্রায় প্রত্যেক ক্লাবেরই মা দুর্গা-লক্ষ্মী সরস্বতী-কার্ত্তিক-গণেশ পাঁচটি আলাদা আলাদা আলোকসজ্জিত লরীতে উঠে শোভাযাত্রা করতে করতে গঙ্গাতীরে আসছিলেন, একটি নামকরা ক্লাবের ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া হল। অতগুলি পরমরমণীয় ঠাকুর একে একে গঙ্গায় ডুবে গেলেন। মিষ্টার ভস্কি বিস্ফারিত নয়নে জিজ্ঞাসা করলেন,—'এই "অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে বায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে" দেবদেবী কোথায় গেলেন ?'

আমি বললাম,—'শ্বশুর বাড়ী। মা মেনকার কান্নার মেয়ে দুর্গা তিনদিনের জন্য ছেলেপুলে নিয়ে বাপের বাড়ী এসেছিলেন। আজ ফিরে গেলেন।'

মিষ্টার ভস্কি বিচিত্র বাজনার শব্দে অবাক হয়ে বাঁদিকে তাকালেন। আমিও তাকিয়ে দেখি একটি ক্লাবের ঠাকুর আনা হচ্ছে। ঠাকুর দাঁড় ক'রিয়ে ক্লাবের সদস্যরা বাজনা ও নাচের আসর জমিয়ে ফেলেছেন। পনের-ষোলজন যুবক টোকা মাথায় দিয়ে জোর কদমে তাসা ও ডুগডুগি বাজাচ্ছেন। সাত-আটজন চাপা প্যান্টপরা রোগা লিকলিকে যুবক টুইস্ট নাচছেন। আর চার কোণে চারজন যুবক ফুটবলমাঠের লাইনস্ম্যানের মত দাঁড়িয়ে মুখগহ্বরে দুটো করে আঙুল পুরে ফিঁচ্ ফিঁচ শব্দে বাজনা ও নাচের তালে তালে সিটি বাজাচ্ছে।

আমি লজ্জিত হলাম। মিষ্টার ভস্কি অবাক হলেন। আমি বললাম,—'ইয়ংম্যানরা পূজায় একটু আনন্দ করছে।'

মিষ্টার ভস্কি বললেন,—'আপনি বলিয়াছিলেন দুর্গাপূজায় বাঙালীরা ভক্তিরসে আপ্লুত হয়, কিন্তু আমি ত' ভক্তির চিহ্নমাত্র দেখিতেছি না। উঃ কি কারবার!'

মিষ্টার ভস্কির বিদায়ের দিন এসে গেল। আমরা 'চলন্তিকা সাহিত্য সংস্থার পক্ষ থেকে আবার একরাশ ফুলমালা নিয়ে দমদম বিমানঘাঁটিতে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে গেলাম। মিষ্টার ভস্কি সাশ্রুনয়নে ফুলের মালা পরে বিদায় নিচ্ছেন, এমন সময় রিপোর্টারদের দল মিষ্টার ভস্কিকে ঘিরে ধরলেন। প্রত্যেক রিপোর্টারের মুখে একই প্রশ্ন,—'কেমন দেখলেন বাংলাকে, বাঙালীকে, কেমন লাগল বাংলা সাহিত্য ?'

সকলের প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত হয়ে মিষ্টার ভস্কি একটি চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন,—

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী,

জাহাজডুবি

এই তমালতালীবনরাজিনীলা স্বচ্ছসলিলা সুজলাং সুফলাং পুষ্পিত বৃক্ষলতাকুঞ্জ সমন্বিতা বঙ্গভূমির কথা বঙ্কিমসাহিত্য হইতে পাঠ করিয়াছিলাম। এই রত্নপ্রসবিনী স্বপ্নময় বঙ্গভূমিকে দেখিবার জন্য প্রাণ চঞ্চল হইত।

কিন্তু বর্তমানে সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার উৎসাহ মন্দীভূত হইয়াছে। বঙ্কিম-রবীন্দ্র হইতে শুরু করিয়া সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সকল বহি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলাম। বঙ্কিমের সেই সুজলাং সুফলাং বঙ্গভূমি কোথায় গিয়াছে? বর্তমানে খণ্ডিত বঙ্গ বৃক্ষহীন হইতে চলিয়াছে। মর্মর প্রাসাদের পার্শ্বে শ্মশানতুল্য মানব। অহো! কি কারবার!

পূর্বেকার সেই গম্ভীর নাদময়ী, অলংকার ও লাবণ্যময়ী ভাষাও হারাইয়া গেছে গিয়া। সাম্প্রতিক ভাষায় আর মৃদঙ্গ বাজেনাকো! বঙ্কিমী সাহিত্যের সেই অমৃত-ধারা, রবীন্দ্রের সেই—'শীতলছায়া আমকাঁঠালের বন, পুকুরের পার, কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত ও সন্ধ্যা'—'প্রকৃতির শান্তির মধ্যে স্নিগ্ধছায়া, শ্যামল নীড়ের মধ্যে যেমন ছোট ছোট হৃদয়ের ব্যাকুলতা দোয়েল, কোকিল, বউ-কথা কও এর' গান প্রভৃতি সাম্প্রতিক সাহিত্যিকদের ঠেঁঙে আশা করা যায় না। এই অমৃতনির্ঝর ভাষার পার্শ্বে সাম্প্রতিক সাহিত্যিক বলিতেছেন, —'শালা বেশি বাতেলা মারিস নি, কোন সময় হেভি ঝাড় খেয়ে যাবি।'

তজ্জন্য আমি বিমর্ষ চিত্তে বিদায় লইতেছি। আমার বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎই ভাল। তারাশঙ্কর-বিভূতি-মাণিক ভাল। কল্লোলযুগ ও তৎপরবর্তী কয়েকজন ভাল। কিন্তু সাম্প্রতিক কয়েকজন বাঙালী সাহিত্যিক ও বাঙালী হিপি আমাকে পীড়া দিয়াছে। ক্যাম্‌নে ইহাদের সহ্য করিব? অলমিতি বিস্তারেণ।

মিষ্টার ভক্সির বক্তৃতা শেষ হল। রিপোর্টাররা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে চলে গেলেন। ফুলের মালা পরে মিষ্টার ভক্সি হাত নেড়ে নেড়ে বিদায় নিলেন। যাওয়ার সময় ভক্সিসাহেব বললেন,—'বিদায়'!

কিন্তু আমাদের বাঙালীদের বিদায় জানাবার পদ্ধতি একটু অন্যরকম। আমরা বিদায় জানাবার সময় বলি,—এস, আবার এস। তাই মিষ্টার ভক্সিকে বললাম,—এস, আবার এস।

খাদ্য বর্ণনার উদ্ধৃতি:

১ করুণানিধান বিলাস—জয়নারায়ণ ঘোষাল

২ রামায়ণ—দ্বিজ রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যব্রত রায়

লোকাল ট্রেনে কিছুক্ষণ

আমি কলকাতায় কলেজ ষ্ট্রীটে থাকি। এই রাস্তারই একটা কলেজে ছেলে পড়াই। বাড়ী থেকে পাঁচ মিনিট দূরেই আমার কর্ম্মস্থল। আমার ভ্রমণ-ভাগ্যও ওইটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাজেই বাস-ট্রামের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই বললেই চলে। অনেক সময় এক একটা ডবলডেকার জনগণের ভারে তেরছা হয়ে তেড়ে আসে আর আমার ব্লাড-প্রেসার বেড়ে যায়। চলন্ত ট্রামের বাইরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর দুই ভদ্রলোকের মারামারি দেখতে দেখতে সরস গল্পের পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে বাড়ী ফিরি। যাইহোক, আমার সৌভাগ্য যে আমি পদব্রজেই যাতায়াত করি।

এইসব দৃশ্য দেখেই বোধহয় জওহরলাল নেহরু কলকাতাকে দুঃস্বপ্ন নগরী বলেছিলেন। যাত্রী সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ। কলেজে যাওয়ার সময় এবং কলেজ থেকে ফেরার সময় যা দু চারটে দৃশ্য চোখে পড়ে। যেমন ঝুলন্ত যাত্রী, ছুটন্ত যাত্রী, গরমে গলন্ত যাত্রী, রাজনৈতিক আলোচনায় ফুটন্ত যাত্রী, পায়ে প্রাণান্তকর পাঁড়া দেওয়ার জন্য বাপান্ত হওয়া যাত্রী, ক্রোধে জ্বলন্ত যাত্রী, চাপে নিভন্ত যাত্রী—আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার এই দিয়েই ভরা ছিল।

আমার এক বন্ধুর মোটরে চড়ে একদিন ভোরবেলায় শেওড়াফুলি গিয়েছিলাম তাঁর নূতন বাড়ী দেখার জন্য। তাঁর বাড়ীতে গল্পগুজব করে সকাল নটায় ভোজনপর্ব্ব সেরে বিদায় নিলাম। আসার সময় ট্রেনে এলাম। এই প্রথম আমার ইলেকট্রিক ট্রেনে চড়া। শেওড়াফুলি থেকে হাওড়া ষ্টেশনে আসতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম সেই গল্পই আজ

আপনাদের শোনাব। সেদিন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলাম আমার অভিজ্ঞতার স্বল্পতা। কি আশ্চর্য! আমার অভিজ্ঞতার ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরে বহু বিচিত্র এই জগৎ পরে আছে, আর আমি তার কিছুই জানতাম না!

শেওড়াফুলি স্টেশনে যথাসময়ে তারকেশ্বর লোকাল এল। একটি বড় বগীতে উঠে বসলাম। ট্রেন ছাড়তে তখনও আট মিনিট বাকী। একে একে অফিস-যাত্রীরা উঠতে লাগলেন! কেউ কেউ ছুটে এসে মনের মতো সীটে বসে পড়লেন। আর একদল লোক হারমোনিয়ম, খোল, ডুগডুগি, আড়-বাঁশী, সাত-আটজোড়া কর্তাল ও খুঞ্জনি নিয়ে কম্পার্টমেন্টের শেষের এক-তৃতীয়াংশ দখল করলেন। বেলকাঠের মালা পরা গেরুয়াধারী খোঁপাবাঁধা এক ভদ্রলোক তাঁর দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে থলিটা নামালেন। ইনি সন্ন্যাসী নন, একজন হরিভক্ত অফিসযাত্রী। এই হরিভক্ত ভদ্রলোক হারমোনিয়মটা কোলের ওপর টেনে নিয়ে বসলেন মধ্যমণি হয়ে। ওঁর বাঁ পাশে এক স্থূলকায় ভদ্রলোক খোল এবং ডানপাশে একজন শীর্ণকায় নামাবলী পরিহিত ভদ্রলোক ডুগডুগি নিয়ে বসলেন। এবার সিল্কের পাঞ্জাবী ও রিমলেস চশমা পরা এক ভদ্রলোক উঠলেন। তাঁর মাথায় স্ত্রীলোকের মতো লম্বা চুল। কিন্তু খোঁপা বাঁধেন নি। সরু চিরুণী দিয়ে পরিপাটি করে আঁচড়ে পিছন দিক থেকে কোমর পর্যন্ত নামিয়ে দিয়েছেন। ইনি কাঁধে ঝোলান রঙীন থলি থেকে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর আলেখ্য বের করে বাঙ্কের ওপর দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন। একটি ফুলের মালা দেওয়া হল। দু'তিনটি ধূপকাঠি জ্বালিয়ে মহাপ্রভুর ফটোর ফ্রেমের ফাঁকে গুঁজে দেওয়া হল। তারপর ইনি আড়বাঁশীটি নিয়ে গেরুয়াধারীর সামনে বসলেন। এঁদের দলের বাকী আটজন খুঞ্জনী নিলেন। 'জয় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কি জয়'!—সমস্বরে এই চিৎকার উঠল। ট্রেন ছেড়ে দিল।

তারপরই হারমোনিয়ম বেজে উঠল, খোলে চাঁটি পড়ল, ডুগডুগি বেজে উঠল, আড়বাঁশী যেন গান গেয়ে উঠল, আটজোড়া খুঞ্জনি বাজতে লাগল। আশেপাশে যাঁরা খালিহাতে বসে বা দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরাও চোখবুজে মাথা দোলাতে দোলাতে তালে তালে হাততালি দিতে লাগলেন। গান শুরু হল,—

তোদের হাতে ধরি পায়ে ধরি

গোবিন্দ ভজরে—

ওরে হরিনামে কাটবে ভ্রান্তি

সারাজীবন পাবি শান্তি
ওরে হেলেগুলে সকল ভুলে
প্রাণগোবিন্দ ভজরে—
তোদের হাতে ধরি পায়ে ধরি
গোবিন্দ ভজরে—

গান শুনতে শুনতে বেশ তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে আসায় দেখি বাসন্তীরঙের কাপড় পরা কয়েকজন লোক গাড়ীর মেঝেয় জোড়াসনে বসে আছেন। 'বাবা তারকেশ্বরের চরণে সেবা লাগে' বলে গাঁজার কল্কে ফাটানোর চেষ্টা করছেন। একপাশে চোদ্দ-পনেরটি পিতলের ঝুমঝুমি লাগানো বাঁশের রঙীন বাঁক দাঁড় করানো। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। সামনের শীর্ণকায় এক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম,—'এরা কারা, কোত্থেকে আসছে?' বৃদ্ধ দন্তহীন হাসি হাসলেন,—'ওরা তারকেশ্বর থেকে আসছে। কাল রাতে বোধহয় বাবার মাথায় জল ঢালতে গেছল।'

—'কিন্তু কলকে ফাটাচ্ছে কেন?'

—'আজ্ঞে, যার যেমন রুচি। ওরা যাওয়ার সময়ও ফাটায়, আসার সময়ও ফাটায়। তারকেশ্বরে যাওয়ার সময় শেওড়াফুলি থেকে বাঁকে করে জল নিয়ে পায়ে হেঁটে তারকেশ্বরে যায়। বাবার মাথায় জল ঢেলে গ্যাঁজা টানতে টানতে ঘরে ফেরে।'

এমন সময় বাবা তারকনাথের একজন ভক্ত চিৎকার উঠল,—'বোম শঙ্কর!' পাল্টা চিৎকার করে উকিল ভদ্রলোক বললেন,—'এই চিল্লাও মৎ!' ভক্ত চুপ করে গেল।

ওদিক থেকে ভেসে আসছে,—'ওরে গোবিন্দ আনন্দ মুকুন্দ বল।' এক ভক্ত তখন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর ফটোর দিকে তাকিয়ে দু'হাত তুলে নাচছেন।

শ্রীরামপুর স্টেশন এসে গেল। জানালা দিয়ে হেঁকে যাচ্ছে—'পান-বিড়ি-সিগারেট'—'চা-গরম'—'চাই ঝালমুড়ি'—'চাই ডিমসেদ্ধ'

এক ভদ্রলোক ভীড় ঠেলে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। ওঁকে দেখেই আমার আশেপাশের কয়েকজন ভদ্রলোকের গাম্ভীর্য উবে গেল। একজন বললেন,—'কিরে শ্লা! এতক্ষণে! ঝাড়ন পকেটে নিয়ে তারকেশ্বর থেকে বসে আছি। শিগগির তাস বের কর।'

ওঁকে বসতে দেওয়ার জন্য সকলেই পরমোৎসাহে একটু একটু করে সরে এলেন। আমি জানালার পাশে লেপটে গেলাম। ভদ্রলোক পকেট থেকে ঝাড়ন বের করে মুখোমুখি চারজোড়া ঠ্যাং-এর ওপর বিছিয়ে দিলেন। তাসখেলা শুরু হয়ে গেল।

ট্রেন শ্রীরামপুর স্টেশন ছেড়ে দিল।

কামরার একপ্রান্ত থেকে ভেসে আসছে—'আহা নামের সুধায় নিত্যানন্দ গড়াগড়ি যায়', আর একপ্রান্ত থেকে ভেসে আসছে—'ব্যোম শঙ্কর!' আর আমাদের গণ্ডীতে শুরু হয়ে গেছে—'ওয়ান নো ট্রাম'—'টু স্পেড'—'ফোর হার্টস্'—'ফোর নো ট্রাম'—'ডাবল্' ঝাড়নের ওপর তাস পড়তে লাগল। হঠাৎ ওদের মধ্যে দন্তহীন এক বৃদ্ধ চেঁচিয়ে উঠলেন,—'গোলামটা দিলি না কেন? তাহলে সাহেবটা ধরা পড়ত। ধরা পড়লেই আমার সবকটা পিট ষ্ট্যাণ্ডিং, গেম কেউ রুখতে পারত?'

তরুণ ভদ্রলোক বললেন,—'আমি কি করে বুঝব কোন হাতে সাহেব আছে? তাছাড়া সাহেব কি সিঙ্গল টোন?'

উৎসুক দর্শকের মধ্যে একজন বললেন,—'হ্যাঁ ঠিক কথা, সাহেব যখন সিঙ্গল টোন নয়, তখন উনি কেন সাহেব ছাড়বেন?'

তাস-দলের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক দর্শকের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে আবার খেলায় মন দিলেন।

রিষড়া স্টেশনে গাড়ীটি দাঁড়াল। জানালা দিয়ে আবার একের পর হেঁকে গেল,—'পান খাবেন?'—'গরম সিঙ্গাড়া ছিল, দেব নাকি?'—'এই যে টাটকা আদি-আসল-অরিজিন্যাল চ্যানাচুর'—'চাই গরম আলুর চপ-বেগুনী-ফুলুড়ি' ..

দু' তিনজন নেমে গেলেন। কুড়ি-পঁচিশজন উঠলেন। এঁরা কোনরকমে হাণ্ডেল ধরেই রাজনৈতিক আলোচনা শুরু করে দিলেন। ভীড়ের চাপে কার মুখ দিয়ে যে কি বেরোচ্ছে বোঝা যাচ্ছিল না। তবে কথাগুলি ভেসে আসছিল, —'চুপ করুন মশাই চুপ করুন! পলিটিক্সের প' বোঝেন না, এ নিয়ে দাঁত ফোটাবেন না।'

—কি চুপ করব? কেন চুপ করব? যেদিন থেকে ওই শালা মন্ত্রী হয়েছে, সেইদিন থেকেই দেশের এই দুর্দশা!

—বেশী বাজে কথা বলবেন না!

—চোপ্ !

মোটা গোলগাল এক ভদ্রলোক টাকের ঘাম কেঁখে ফেলছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ভদ্রলোকের একজন এঁকে সালিশ মেনে বললেন,—এই সর্ট টাইমে যা করেছে তাই যথেষ্ট ; কি বলেন ?

ইনি বললেন,—একশ'বার।

অপর প্রতিদ্বন্দ্বীও এই গোলগাল ভদ্রলোককে বললেন,—ওই রকম একটা ইডিয়ট দেশ চালাতে পারে ?

ইনি বললেন,— একশ'বার।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বীতে আবার যুদ্ধ লেগে গেল। একজন আর একজনকে বললেন, —'ফের যদি বাজে কথাটা বলবেন ত' চড়িয়ে দাঁত খুলে নেব।'

—কি বললেন ? ঘাড় ধরে ট্রেন থেকে ছুঁড়ে লাইনের খোয়ার ওপর ফেলে দেব। রাস্কেল কোথাকার !

—সাট-আপ !

—চোপ !

উত্তরপাড়া স্টেশন এসে গেল। কেউ নামলেন না। আরও কয়েকজন যাত্রী উঠলেন। ভীড় ঠেলে একজন ক্যানভাসার এগিয়ে এসে বললেন'—'স্যার, চন্দ্রলোকে যাবেন নাকি ? যদি যেতে চান ত' বলুন। আমার এই কস্তুরীমৃগ ধূপকাঠি একটি জ্বাললে উর্দ্ধলোকে, দুটি জ্বাললে কৈলাশে, তিনটি জ্বাললে চন্দ্রলোকে আপনাকে পৌঁছে দেবে। যদি কোন দাদার দরকার হয়, ডাক দিয়ে চেয়ে নেবেন।'

কিন্তু কেউই ডাক দিল না। হঠাৎ দুই বৃদ্ধের কথোপকথন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল,—

—'আমার আর কোন বংশধর রইল না বাঁশীবাবু!

—'ক্যান ক্যান খগেনবাবু?

—বড়ছেলের কোন ছেলেপুলে হল না। ডাক্তার বলেছে আর হবে না। মেজছেলে ঘরছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছে। আর ছোটটি নভেল পড়ে আর হিন্দী সিনেমা দেখে এমন ডেঁপো হয়েছে যে এক ছোটজাতের মেয়েকে বিয়ে করে সরে পড়েছে।'

—ইস্ সবই কর্মফল আর কি ?

সত্যি কি করুণ। ভদ্রলোক একেবারে অবলম্বনহীন হয়ে পড়েছেন।

ট্রেনটা যখন বালিতে এসেছে, কীর্ত্তনও তখন সপ্তমে চড়েছে। সকলের কণ্ঠ ছাপিয়ে সুর ভেসে আসছে,—

ওরে তুলে ধর তুলে ধর
নামের ঠেলায় পড়ে গেছি
তুলে ধর তুলে ধর ..

এদিকে লাইন দিয়ে ক্যানভাসাররা চেঁচাতে লাগলেন,—'এই যে নিয়ে যান 'দি গ্রেট বাঁশবেড়ে লিকপ্রুফ ফাউণ্টেন পেন কোম্পানী'র এ্যাপোলো-২৫ পেন। দাম মাত্র চল্লিশ নয়া। দশ বছরের গ্যারান্টি যুক্ত। এর সঙ্গে ফ্রি একটি নিব ও দুটি জিভ পাচ্ছেন। দশবছরের মধ্যে এর গা ফেটে গেলে পুরস্কার হিসাবে দশটি পেন, জিভ বেঁকে গেলে কুড়িটি পেন, প্যাঁচ কেটে গেলে তিরিশটি পেন, নিব বেঁকে গেলে চল্লিশটি পেন এবং কালি লিক করলে পঞ্চাশটি পেন পুরস্কার পাচ্ছেন। একবার পরীক্ষা করে দেখুন!'

'যাঁরা বছরের পর বছর পেটের গোলমালে ভুগে ভুগে ডাক্তার কবিরাজের তফিলে পয়সা ঢেলে হাঁফিয়ে গেছেন, তাঁরা আমার এই 'নাড়ী-সুধা' টনিক নিয়ে যান। রোগ নির্মূল না হলে খালি শিশি দেখালেই সুদ-সমেত মূল্য ফেরৎ দেব। আর একেবারে কাজ না হলে এই থ্রি-ফর্টিফোর তারকেশ্বর আপে আমাকে জুতিয়ে লাট করে দেবেন।'

'কচি আম-কোকোনাট-পাতিলেবু-আদা ও আমলকি এই পাঁচরকম লজেন্স এনেছি। অফিসে যাওয়ার পথে মুখে ফেলে রাখুন। শান্তি হবে।'

ট্রেন থামল। লিলুয়া স্টেশন। কোন ফাঁকে বেলুড় পেরিয়ে এসেছি খেয়ালই করিনি। চারিদিকের গোলমালে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছিল। ক্যানভাসারদের বক্তৃতা তখনও শেষ হয়নি।

লিলুয়া ষ্টেশন ছেড়ে ট্রেন ছুটেছে হাওড়ার দিকে। নাঃ আর পারছি না। কখন যে হাওড়ায় গিয়ে পৌঁছব। শেওড়াফুলি ষ্টেশনে প্রথম যে বিগতদন্ত বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তিনি আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বললেন,—

—মশায়ের বুঝি ডেলি-প্যাসেঞ্জারির অভ্যাস নেই!

—আজ্ঞে না। আপনারা কি এইভাবেই রোজ যাতায়াত করেন!

সত্যব্রত রায়

—নিশ্চয়ই ! পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে রোজই যাতায়াত করছি।

—অত দূর থেকে রোজ যাতায়াত করার ঝুঁকি নেওয়া—

বৃদ্ধ দন্তহীন হাসি হেসে বললেন,—আজ্ঞে, ডেলি প্যাসেঞ্জারদের কিছু হয় না। পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে দেখছি, কত বোম্ পড়ল, কতবার লাইন ওপড়াল, কত মিলিটারি টহল দিল, সাতচল্লিশের সেই বীভৎস হিঁদু-মোছলমান দাঙ্গা হল, এ পর্যন্ত কমপক্ষে সাড়ে সাতশ বার ট্রেনে অগ্নিসংযোগ করা হল, কিন্তু ডেলি প্যাসেঞ্জারদের কেউ রুখতে পেরেছে? যতই দাঙ্গা হোক, কারফিউ হোক, গুলি চলুক,—আমরা ঠিক কাটিয়ে বেরিয়ে যাব।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম,—'তাই নাকি ?

—নিশ্চয়ই ! এই আমার কথাই ভাবুন ! সাতচল্লিশের সেই দাঙ্গা কতদিন ধরে চলল। চোখের সামনে হাজার হাজার হিঁদুভাই, হাজার হাজার মোছলমান ভাই মরতে লাগল। কিন্তু আমি প্রত্যেকদিন অফিস ছুটির পর কলকাতা থেকে বাজার সেরে বাড়ী ফিরেছি। গণ্ডগোল ত' গেলেই আছে। সেই মধুর যৌবনকাল থেকে আজকের এই হয়ে আসা অবস্থা পর্যন্ত সব কাটিয়ে কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি।

বৃদ্ধের প্রতি আমার মনপ্রাণ শ্রদ্ধায় ভরে গেল। কত ঝড়-ঝংঝা সহ্য করে ইনি এমন শান্ত নির্বিকার হতে পেরেছেন।

বৃদ্ধ আবার বললেন,—তবে হ্যাঁ, আমাদের সব সয়ে গেছে বটে, কিন্তু আপনার মত যাঁরা হঠাৎ আসবেন তাঁদের মাথা খারাপই হয়ে যাবে। আপনি ঠিক জিনিষ ঠাওর করতে চান ত' চোখবুজে বসে থাকুন। দেখবেন কতরকম আওয়াজ আপনার কানে আসবে।

অভিজ্ঞ বৃদ্ধের কথায় চোখ বুজলাম। কানে ঠিক যা যা এসেছিল, হুবহু তাই তুলে ধরলাম,—

'একটু ভদ্রতাও জানেন না ? মুখ সামলে কথা বলবেন !'—'চাই কচিশশা' —'বোম শঙ্কর'—'লোকে দাঁড়াতে পারছে না আর ব্যাটা বসে গাঁজা টানছিস'— 'হরি হরয়ে নম, কৃষ্ণ যাদবায় নম'—'চোপ'—'ত্রিফলার চাটনী দেব'—'এ গভর্ণমেণ্ট দুদিনে বসে যাবে মশাই'—'কাল বড়বাবুকে কেমন টাইট দিলুম'— 'আমি হলুম তারকেশ্বরের ভবতারণ বাগ, আজ পঁয়ত্রিশ বছর কেরানীগিরি করছি, জীবনে কোন শালাকে তেল দিইনি'—'ডিমসেদ্ধ খাবেন ! আজকেরই পাড়া ডিম,

একটু আগে লিলুয়ায় সেদ্ধ করা'—'এই কেতকী, আজ কলেজ পালিয়ে দুপুর তিনটায় গড়িয়াহাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে থেক, 'তেরা প্যার মেরা হিম্মৎ' দেখব'—'চারটে চোখ লাগিয়েও পা মাড়িয়ে দিলেন'—'ট্যাক্সি হাঁকিয়ে গেলেই ত' পারেন !'—'নে নে চটপট ট্রাম কর, ট্রাম কর ; আরে শ্লা, ট্রাম করবি ত বড় তাস দিয়ে কর।'—'বাঁশরী ফুকারে রাধাশ্যাম, আহা শ্রীখোল কহিছে হরে রাম।'

আমি চোখ খুললাম। বৃদ্ধ ভদ্রলোক সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন.'—অভিজ্ঞতা বাড়েনে ?'

আমি বললাম,—'বিলক্ষণ বিলক্ষণ ! প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি।'

একটু ঝাঁকি দিয়ে ট্রেণটা থামল।, হাওড়া স্টেশন। বিশ্বাস করুন, মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট ট্রেনে ছিলাম। অথচ মনে হল পয়তাল্লিশ বছর ওইখানে কাটিয়ে হরেকরকম অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরলাম।

———

সত্যব্রত রায়

আমাদের ডিপিবাবু

শেষপর্যন্ত 'ডিপি'বাবুকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে হল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা কিংবা রূপদর্শীর ব্রজদার মতো আমাদের 'ডিপি'দাও আপন সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট। আমাদের অফিসের এই মানুষটির পুরো নাম দেবীপ্রসাদ ভড়—সংক্ষেপে ডি. পি. ভড়—আরও সংক্ষেপে ডি. পি। এঁকে আমরা ডিপিবাবু বা ডিপিদা বলেই ডাকি।

সেদিন অফিসে দুপুরের টিফিন সারার পর আমাদের আড্ডাটা বেশ জমে উঠেছে। নির্মলবাবু গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের ওপর দু'চারটে কথা বললেন।

—'আরে এই নিয়েই ত' মহাত্মাগান্ধীর সঙ্গে আমার ঝগড়া!'—ডিপিবাবু আড্ডার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে কথাগুলি বললেন। আমরা আরও কিছু শোনার জন্য উৎসুক হয়ে ডিপিবাবুর দিকে চেয়ে রইলাম। ডিপিবাবু বললেন,—'সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা। আপনারা কেউই তখন এ পৃথিবীতে ছিলেন না। গান্ধীজীর সঙ্গে যখন ঝগড়া লাগল—সে কি তুমুল ঝগড়া!—গান্ধীজী অশ্রুবিসর্জন করলেন, নেতাজী আমাকে ভুল বুঝলেন, ভারতের কোটি কোটি মানুষ যে যা পারল তাই বুঝল।'

আমরা সমস্বরে বললাম,—ডিপিবাবু, একটু পরিষ্কার করে বলুন কি হয়েছিল? গান্ধীজীই বা কেন কেঁদে ফেললেন, নেতাজীই বা কেন ভুল বুঝলেন আর দেশের কোটি কোটি মানুষ!—'

জাহাজডুবি

—'হ্যাঁ, সেই কথাই আজ বলব। আমি তখন নেতাজীর একনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলুম। আমার পরামর্শ ছাড়া নেতাজী এক পাও চলতেন না। আমারই মন্ত্রণায় নেতাজী হনলুলুতে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈন্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময় আমি গান্ধীজীর অহিংস নীতির বিরুদ্ধে কলকাতার মাঠে ময়দানে আগুণ ছড়াচ্ছিলাম। আরও ভাল করে দেশকে জাগাবার জন্য আমাদের বেলেঘাটার বাড়ীর উঠানে আমার লেখা "অরূপের স্বপ্ন" নাটকটি মঞ্চস্থ করার আয়োজন করছি, এমন সময় গান্ধীজী আলমোড়া থেকে বেলেঘাটার বাড়ীতে এসে হাজির।'

ডিপিবাবুর কথায় ছেদ টেনে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম,—'বেলেঘাটার বাড়ীর উঠানে নাটক হবে, গান্ধীজী সে খবর পেলেন কি করে?'

—'আর বল কেন? রিপোর্টারদের জ্বালায় কি কিছু গোপন থাকে? তখন আমার মুখ দিয়ে এক একটা শব্দ বেরুচ্ছে আর সারা পৃথিবী তোলপাড় হচ্ছে। গান্ধীজী সম্ভবতঃ 'ষ্টেটস্ম্যানে' খবর দেখেই আলমোড়া থেকে সোজা বেলেঘাটায় ছুটে এসেছিলেন!

'অরূপের স্বপ্ন' নাটক মঞ্চস্থ হল। দর্শককুল তখন স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হচ্ছে। আর সে কি অভিনয়! আমি নিজেই দেশনায়কের পার্টটা করছিলাম। যেই একটি রাইফেল নিয়ে উইংস্-এর আড়াল থেকে সগর্জনে লাফ দিয়ে মঞ্চে এসে বললাম,—'চলো দিল্লী!'—অভিভূত দর্শককুল দিল্লীর দিকে মুখ করে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল। দেশের জনসাধারণ অহিংস নীতিতে আস্থা হারিয়ে ফেলছে দেখে মহাত্মা গান্ধী হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। সে কি অপূর্ব দৃশ্য!'

—'কিন্তু নেতাজী আপনাকে ভুল বুঝলে কি করে?'

—'বলছি, সব বলছি। 'অরূপের স্বপ্ন' নাটক দেখার পর অশ্রুসজল গান্ধীজী আমায় বলেছেন,—'ডিপি! এবার তুমি অহিংস নীতিতে মত দাও।' কিন্তু আমি কিছুতেই মত দিলাম না। পর পর সাতদিন ধরে ভারতের সব কাগজে একই সংবাদ—'আজও ডি, পি, ভড়ের মত অপরিবর্ত্তিত।' শেষপর্যন্ত আট দিনের দিন আমি মত দিলাম।'

আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম—'এ্যাঁ, সে কি! আপনি মত দিলেন!'

—'আর বল কেন? মনে হয় গান্ধীজীর চোখদুটিতে কি যেন ছিল।

আমি যেন হিপ্নোটাইজ্‌ড হয়ে গিয়েছিলাম। পরদিন সারা দুনিয়ায় সেই খবর ছড়িয়ে পড়ল। সব কাগজেই বিরাট ছবি। আমি গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আর মহাত্মাজী আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রাণভরে হাসছেন। ওদিকে হনলুলুতে বসে নেতাজী খবর পড়লেন, ছবি দেখলেন। তারপর টেলিগ্রাম করে শুধু একটি কথাই জানালেন, 'ডিপি! আমায় গাছে চড়িয়ে তুমি মই কেড়ে নিলে! ছিঃ!' সেই থেকেই নেতাজীর সঙ্গে আমার ভুল বোঝাবুঝি।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম,—ডিপিবাবু, নেতাজীর সঙ্গে আর কখনও আপনার দেখা হয়নি?

ডিপিবাবু বললেন,—হ্যাঁ হয়েছে। মাত্র তিনবার। নেতাজী যখন ভারত ছেড়ে পালিয়ে যান তখন আমি তাঁকে কাবুল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তিনি এত রেগে গিয়েছিলেন যে কলকাতা থেকে কাবুল পর্যন্ত আমার সঙ্গে একটা কথাও বলেন নি। দ্বিতীয়বার দেখা হয়েছিল জাপানে!

'জাপানে? আপনি কি জাপানে গিয়েছিলেন? নেতাজী কি জাপানে ছিলেন?'

—হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ একবার আমাকে জাপানে পাঠিয়েছিলেন? জাপানে সমস্ত ইউনিভার্সিটিতে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে লেকচার দিয়ে বেড়াতাম। একদিন নোগুচি উগুচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোচ্ছি, এমন সময় নেতাজীর সঙ্গে দেখা। বহুদিন পর নেতাজী আমাকে দেখে ভারতের খবরাখবর নিলেন। পরদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি তিনি আবার আত্মগোপন করছেন। আর এখন ত' রোজই দেখা হচ্ছে। কিন্তু থাক সে কথা।

আমরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠলাম, কি বললেন? নেতাজীর সঙ্গে রোজ দেখা হচ্ছে? কোথায় দেখা হচ্ছে? নেতাজী কি জীবিত?

অফিসের বেয়ারার শ্রীবংশীধর পারিদা বলল,—কঁড় কহিলা? নেতাজী বঁচি রহিছি?

ডিপিবাবু বললেন—না থাক! গোপনতথ্যটা আর ফাঁস করব না!

আমরাও নাছোড়বান্দা—না না আপনাকে বলতেই হবে।

বংশীধর বলল,—নেতাজী অথন কেমন্তি অছি, কৌ পাখেরে অছি, কঁড় খাউচি?

ডিপিবাবু বললেন,—নানা আমি তা পারি না ভাই! মর‍্যালিটির দিক থেকে

তা পারি না।

কিন্তু আমরাও ধরে বসলাম,—আপনাকে বলতেই হবে নেতাজী বেঁচে আছেন কিনা!

—হ্যাঁ আছেন, বেশ বহাল তবিয়তেই আছেন,—ডিপিবাবুর জবাব।

বংশী নেচে উঠল,—ওঃ নেতাজী বঁচি রহিছি, খুশীড়ি মোর পরাণ কাঁপুচি।

'নেতাজী কোথায় আছেন ?'—ডিপিবাবুকে আমাদের প্রশ্ন।

—প্লিজ ওকথাটা আর জিজ্ঞেস করবেন না। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন তিনি আছেন, এই বাংলাদেশেই আছেন।

—'বাংলাদেশে আছেন! তবে শিগগির বলুন কোথায় আছেন ?

—'বাঞ্ছারাম অক্রুর দত্ত লেনে। আমার বাড়ীতে।'

ডিপিবাবুর উত্তর শুনে আমরা থ' হয়ে বসে রইলাম। কথা বাড়ালাম না। আমাদের নির্বিকার অবস্থা দেখে ডিপিবাবু বোধহয় বুঝেছিলেন যে মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে গেছে। তিনি সামলে নেবার জন্য বলালন,—'ওঃহো, একেবারে ভুলে গেছি, আমাকে বম্বেতে একটা জরুরী ট্রাঙ্ককল করতে হবে। আমি চললুম।'

পরদিন টিফিনের সময় আমাদের আড্ডা বেশ সরগরম হয়ে উঠেছিল। বিষয় চন্দ্রমল্লিকা। আমাদের অফিসের শুভেন্দু তার গাছের সবচেয়ে বড় ফুলটি সেদিন এনেছিল। ফুলের শোভা ও আকৃতি দেখে সকলেই শুভেন্দুর পিঠ চাপড়ে দিচ্ছিলাম। এমন সময় ডিপিবাবু এলেন। ফুলের আকার সম্বন্ধে দু'এককথা সম্ভবতঃ তাঁর কানে গিয়েছিল। তিনি এসেই বললেন,—'একি! এইটুকু চন্দ্রমল্লিকা ?'

আমি আশ্চর্য হয়ে ববলাম,—'ডিপিবাবু, এটা ত' বিশাল চন্দ্রমল্লিকা।'

ডিপিবাবু বললেন,—'আমার চন্দ্রমল্লিকা যদি দেখতেন তাহলে আর ওকথা বলতেন না। আমার গাছের চন্দ্রমল্লিকা এক একটা বড় বারকোষের মতো। দেখলেই মনে হয় কয়েক কেজি লাল নীল কাজুবাদাম টাইট করে সেট করা আছে। পাঁচবার আমি স্বর্ণপদক পাই। তারপর রাজ্যপাল মশাই প্রতিযোগিতায় নাম না দেওয়ার জন্য আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তখন থেকে আমি প্রতিযোগিতায় আর নাম দিই না। তবে ভারতে এবং ভারতের বাইরে আমার ফুলের বিশেষ প্রদর্শনী হয়।'

সত্যব্রত রায়

এই কথাগুলি বলেই ডিপিবাবু কি একটা জরুরী কাজ সারতে ব্যস্তে ব্যস্তে হনহন করে চলে গেলেন।

আমরা ঠিক করলাম একদিন ডিপিবাবু বাড়ীতে যাব। তখন উনি কি করে 'ম্যানেজ' করেন তাই দেখব।

রবিবার। আমরা দুজন বন্ধু বাঞ্ছারাম অক্রুর দত্ত লেনে ডিপিবাবুর বাড়ীতে হাজির হলাম। ডিপিবাবুকে বললাম,—'আমরা আপনার গাছের চন্দ্রমল্লিকা দেখতে এসেছি। ডিপিবাবু আমাদের বসতে বলে মলিনমুখে ভেতরে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পরে আমাদের সামনে এসে স্মিতহাস্যে বললেন,—'তোমরা একটু দেরী করে ফেললে! আমার সমস্ত চন্দ্রমল্লিকাই আজ ভোরের প্লেনে ক্যালিফোর্নিয়া চলে গেছে। মিঃ গর্টন নিয়ে গেছেন। সেখানে বিশেষ প্রদর্শনী হবে। আমারও যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সকাল থেকে মাথাটা এমন টিপটিপ করছে যে যাওয়া বন্ধ রাখলাম।

আমাদের মধ্যে অরুণবাবু বেশী উৎসাহী। তিনি বললেন, 'আমাদের দুর্ভাগ্য! চন্দ্রমল্লিকা দেখতে পেলাম না। কিন্তু নেতাজীকে আজ দেখে যাব।'

ডিপিবাবু একটুও অপ্রতিভ হলেন না। বললেন,—আপনারা একেবারে ছেলেমানুষ! সবকথা খুলে বলতে হয়। শুনুন! ওই যে মিঃ গর্টনের কথা বলছিলাম—উনিই নেতাজী। গর্টন ওঁর ছদ্মনাম। উনি ক্যালিফোর্নিয়ায় আমার ফুলের প্রদর্শনী দেবেন আর তারই ফাঁকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করবেন! নেতাজী ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফিরে এলেই আমরা আবার আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করব।'

আমরা বহুদিন ধরেই ডিপিবাবুকে হাতে নাতে ধরার চেষ্টা করছি, কিন্তু তিনি পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছেন। ভেবেছিলাম বাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করলে হয়তো ডিপিবাবু আর মাত্রা বাড়াতে পারবেন না। কিন্তু ডিপিবাবু অম্লানবদনে তাঁর মাত্রা একেবারে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত বাড়িয়ে দিলেন।

ডিপিবাবুর মতো খেলোয়াড়ও দেখা যায় না। যাবতীয় খেলাতেই তিনি পটু। তবে ক্রিকেট আর ফুটবলই তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। শীতের সময় বলেছিলেন তাঁর ক্রিকেট খেলার কথা। ১৯২২ সালে বোরোবুদুরে 'ডবল সেঞ্চুরী' করেছিলেন। ১৯২৩ সালে সাইপ্রাস দ্বীপে 'ত্রিপল্ সেঞ্চুরী' করেছিলেন (তার

জাহাজডুবি

মধ্যে ১৯ টাই ওভার বাউণ্ডারী ছিল)। ১৯২৫ সালে কেমন করে 'অফ-স্পিন' বলে সারা পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ বছরেই অক্টোবর মাসে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বাঘা বাঘা খেলোয়াড়কে 'গুগলি' আর 'লেগব্রেক' বলে কেমন করে চোখের জলে নাকের জলে এক করে দিয়ে 'নট্-আউট' থেকে গিয়েছিলেন সে সব কাহিনী সবিস্তারেই বলেছিলেন।

ডিপিবাবু বললেন,—একবার ইংলণ্ডে ডন ব্র্যাডম্যান আমাকে বেকায়দায় ফেলার জন্য 'সর্টপীচ' বল দেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে 'হুক শর্টে' ওভারবাউণ্ডারী করি। ব্র্যাডম্যানের 'ওভার' শেষ হওয়ার পর এগিয়ে এলেন লিণ্ডওয়াল। তিনি 'ফুলটস' বল দিলেন। আমিও 'ব্যাকফুট ড্রাইভে' পাঠিয়ে দিলাম বাউণ্ডারীর বাইরে। কেউ হারাতে পারছে না দেখে এগিয়ে এলেন ওয়ালকট। তিনি একটা চোস্ত 'বাম্পার' বল দিলেন, আমিও ঠেলে দিলাম অফ-ষ্ট্রাম্পের দিকে। শেষটায় দিলেন 'লেগব্রেক।' আমিও সাথে সাথে একটা 'লেগ-কাট' মারে পাঠিয়ে দিলাম বাউণ্ডারীর বাইরে। চারিদিকে তখন দুন্দুভি বাজছে।

ডিপিবাবু বললেন,—এই ত কিছুদিন আগে 'কোচ' হিসেবে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে খেলা শেখাতে গিয়েছিলাম। স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন, আমি খেলতে ভুলে গেছি কি না! মিঃ ওরেল প্রথমে 'বিমার' বল দেন। মিঃ ওরেল ত' আমার হাতের 'গ্লান্স' মার দেখেনি। এ্যাট-এ-গ্লান্স বলটা হাওয়া হয়ে গেল।

'সেদিন সোবার্স কলকাতায় এসে বলল,—ডিপিদা, একবার ব্যাটটা ধরুন ত'! আমার 'চায়না-ম্যান' বলে যদি কোন মার দেখতে পারেন তবে বুঝব আপনি সত্যিই খেলতে জানেন!

'কিন্তু সোবার্স সেদিনের ছেলে। আমার 'কভার ড্রাইভ' মার ত' দেখেনি। সোবার্সের চায়না-ম্যানের উত্তরে এমন একখানা কভার ড্রাইভ মার দিলাম যে বলটা ফেটে দু-আধখানা হয়ে দুপাশের গ্যালারির বাইরে চলে গেল। সোবার্স আর একটা নূতন বল বার করল। একে একে 'বিমার,' 'বাম্পার,' 'ইয়রকার' বল আসতে লাগল। তবে হ্যাঁ, ছেলেটা খেলে মন্দ না! যাইহোক, আমাকে জব্দ করতে না পেরে শেষটায় একটা কড়া আউট-সুয়িং বল ছুঁড়ল। এবার আমি মারলাম 'ঝাঁটামার।' একখাবলা মাটি সমেত বলটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আপনারা শুনলে অবাক হবেন পৃথিবীতে আমিই প্রথম

ক্রিকেটে ঝাঁটা মারের প্রবর্তন করি।

'একবার ইটালিতে এক ক্রিকেট খেলায় আমি ফিল্ডিং-এ ছিলাম। ব্যাটিং করছিলেন লিণ্ডওয়াল। আমি বল ধরার কায়দা দেখেই বুঝলাম 'বাম্পার' ছুঁড়বে। বল এল। ক্যাচ উঠল। কিন্তু দেখলাম এ ক্যাচ কেউ ধরতে পারবে না। তখন আমি শূন্যে পনের ফুট সাঁতার দিয়ে ক্যাচটা ধরলাম। বিগল্ বাজল, ড্রাম বাজল, চেয়ার ভাঙল, বোমা ফাটল—সারা ইতালি একেবারে থ' হয়ে গেল।'

* * * * *

হ্যাঁ, ফুটবল খেলাতেও ডিপিবাবুর জুড়ি নেই। সেদিন ছিল ইষ্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের ফাইনাল খেলা। অফিসে কাজকর্ম বন্ধ। সবাই খেলার পরিনতি ভেবেই অস্থির। এমন সময় এলেন আমাদের ডিপিবাবু। শুরু হল তাঁর গল্প,—'এ আর কি খেলা! খেলা ছিল আমাদের সময়ে। একবার রাশিয়াতে ঐতিহাসিক সট মেরে পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলাম, তারপর থেকেই খেলা ছেড়ে দিয়েছি।'

'১৯৩৯ সালের ৫ই আগষ্ট। যুদ্ধের ধাক্কায় সারা পৃথিবী তখন গরম। আমি অজান্তে লোকের মন ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য সারা পৃথিবীময় ফুটবলের উপযোগিতা, উপকারিতা প্রভৃতি বিষয়ে লেকচার দিয়ে বেড়াচ্ছি।

'সবেমাত্র হনলুলুর কাজ শেষ করে সেণ্ট হেলেনায় এসে ফুটবলের ওপর লেকচার দিচ্ছি, এমন সময় রাশিয়া থেকে ষ্টালিনের একটা টেলিগ্রাম পেলাম। ষ্টালিন লিখেছিলেন,—'ডিপি, যুদ্ধোত্তর ইউরোপের শান্তি স্থাপনের জন্য আমি মস্কোয় এক প্রীতি-ফুটবল খেলার আয়োজন করেছি। এ খেলায় কোন ভেদাভেদ থাকবে না। চীন, জাপান, জার্মান, ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া সব দেশই খেলবে। তুমি শীঘ্রই এস।'

'ষ্ট্যালিনের আমন্ত্রণে রাশিয়ায় গেলাম। সত্যিই দেখবার মতো সে দৃশ্য। একটি ষ্টেডিয়ামে একসঙ্গে বসে আছে তিরিশ লক্ষ লোক। তারা পৃথিবীর সব দিকপাল খেলোয়াড়দের খেলা দেখতে এসেছে। ক্রমশঃ জড় হল পৃথিবীর বাছাই বাছাই ছাঁকা ছাঁকা দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়রা। রাশিয়ান খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন

জাহাজডুবি

মিঃ ভস্কি, মিঃ কস্কি, মিঃ লস্কি, মিঃ ঝামাকফ এবং মিঃ হরিভজনেস্কি। চীন থেকে গিয়েছিলেন মিঃ টুংলিং, মিঃ লিন লিন পু, মিঃ চুং ফো। ফ্রান্স থেকে গিয়েছিলে মঁসিয়ে গুলিয়ে, মঁসিয়েঁ পিনাত্রা, জুঁ ত্ত ধাপ্পা। ইংলণ্ড থেকে গিয়েছিলেন মিঃ হাডিঞ্জ, মিঃ মরগ্যান, মিঃ ব্রামাঞ্জ; জাপানের মিঃ মশামারা, মিঃ লুগুচি, আমেরিকার মিঃ ডেমপষ্টার মুর, মিঃ ম্যাদাগাস্কার গ্রুম,—এ ছাড়া ছিলেন আরও কয়েকজন দিকপাল। আর রেফারী ছিলেন বাঁশবেড়ের তারিণী বাঁড়ুজ্জে।'

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বললেন,—শেষের কথাটা কি বললেন, বাঁশবেড়ের তারিণী বাঁড়ুজ্জে?

ডিপুবাবু—'হ্যাঁ ঠিকই বলেছি। বাঁশবেড়ের বাঁড়ুজ্জেমশাই রাশিয়ায় গিয়েছিলেন আমসত্ত্বের ব্যবসা করার জন্য। আমিই তাঁকে রেফারী নিযুক্ত করেছিলাম।

'যাইহোক, যা বলছিলাম! দুটি দল তৈরী হল। আমাদের গোলকিপার ছিলেন মিঃ হরিভজনেস্কি। আমি ছিলাম হাফব্যাকে। ব্যাকে ছিলেন মিঃ ব্রামাঞ্জ, মিঃ হাডিঞ্জ, জুঁ-ত্ত-ধাপ্পা এবং মিঃ লিন লিন পু। আর সেণ্টার ফরওয়ার্ডে ছিলেন মিঃ ভস্কি, মিঃ কস্কি, মঁসিয়ে গুলিয়ে, মিঃ নোগুচি এবং মিঃ ম্যাদাগাস্কার গ্রুম। বাকী সব ওপাশে।

বাঁশবেড়ের তারিণী বাঁড়ুজ্জে বাঁশী বাজালেন। খেলা শুরু হল। তিরিশ লক্ষ লোক চিৎকার করে অভিনন্দন জানাল। বল মাটিতে পড়বার সঙ্গে মিঃ চুংফো বল নিয়ে সটপাশে দিলেন মিঃ টুং লিং কে। মিঃ টুং লিং তীরবেগে আমাদের দিকে তেড়ে আসছিলেন, কিন্তু বেগতিক দেখে লিন লিন পু হ্যাণ্ডবল করে দিলেন।

'জোর কদমে খেলা চলছে। আমাদের দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড মিঃ ম্যাদাগাস্কার গ্রুম বল নিয়ে রেসের মাঠের ঘোড়ার মত ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেলেন। মিঃ লস্কি ও মিঃ ঝামাকফ বাধা দিতে গিয়ে ছিটকে পড়ে গেলেন। আছাড় খেলেন মিঃ মরগ্যান, মিঃ চুংফো। ওদের গোলকীপার গাব্রিয়েল ত' ভয়ে সারা আর ধন্য দূরদৃষ্টি বটে মিঃ ম্যাদাগাস্কার গ্রুমের। তখন উত্তরে হাওয়া বইছিল। ওদের গোলপোস্ট ছিল পূবদিকে। অথচ গ্রুম বল মারলেন পূব-দক্ষিণে কোণে। কিন্তু ঐ যে বলেছি উত্তরে হাওয়া। যার জন্য বল ঘুরে এসে—মানে একেবারে 'ইন-সুয়িং' করে গোল দিয়ে দিল। তিরিশ লক্ষ লোক একেবারে হাসিতে ফেটে

চৌচির।

'ওরা একটা গোল খেয়ে বেশ দমে গেল। আমাদের দলের মিঃ ম্যাদাগাস্কার গ্রুমের এই বেয়াদপি কিছুতেই সহ্য করলেন না ওদলের মিঃ ডেমপষ্টার মুর। মিঃ মুর বল নিয়ে তীরের মত আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। বাধা দিতে গিয়ে আছাড় খেলেন মিঃ জুঁ হু ধাপ্পা, ব্রামাপ্ত। মিঃ ফস্কি ঠেকাতে গেলেন কিন্তু তাঁরও পা থেকে বল ফসকে গেল। অনেকদূর এগিয়ে এসেই মিঃ ডেমপস্টার আমায় দেখতে পেল। এবার বাছাধন যাবে কোথায়? আমি ত' বিন্ধ্য-পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে আছি। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে আমি প্রায় সাত-আট ফুট হাইজাম্প দিয়ে বলটাকে হেড করলাম। বলটা চলে গেল মিঃ চুং ফোর দিকে। চুং ফো লং পাসে পাঠালেন মিঃ টুং লিংকে। টুং লিং-এর কাছ থেকে নিয়ে ঝামাকফ আমাকে বিপদে ফেলার জন্য ঐ প্রান্ত থেকে করল একটা 'গ্র্যাস-কাটিং' সর্ট। আমিও পেছন ফিরে এই প্রান্ত থেকে এমন একটা 'ব্যাক-ভলি' দিলাম যে কাউকে আর বলে পা ঠেকাতে হল না। বলটা রাইফেলের গুলির মতো বেগে ওপাশের গোলকীপার মিঃ গাব্রিয়েলের মাথার দু'হাত উঁচু দিয়ে গিয়ে গোল হয়ে গেল।

'দ্বিতীয় অর্ধের খেলা খুব জমেছিল। ওরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে আমাদের হারাবার জন্য। কিন্তু কেউ কাউকে গোল দিতে পারছেনা। এইভাবে খেলা যখন প্রায় শেষ হয়ে এল, তখন মিঃ ঝামাকফ বলটা দিলেন মিঃ ডেমপষ্টার মুরকে। মুর বলটাকে হেড দিলেন—পড়বি ত' পড় আমার সামনে—আমি এমন সর্ট করলাম যে বলটা হাউই বাজীর মতো ওপরে উঠে গেল,—বলটা তখনও উঠছে—ক্রমে ছোট হতে হতে বিন্দুর মতো হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল।'

আমরা নড়েচড়ে বসলাম। দু' একজন একটু কাশলাম।

ডিপিবাবু আমাদের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর আমাদের কাশিতে সংক্রামিত হয়ে গলায় ঝাঁকি দিয়ে খুক খুক করে কাশতে লাগলেন!

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ঘোষ ডিপিবাবুকে বললেন,—'আরে মশায় ঝেড়ে কাশুন!'

ডিপিবাবু বললেন,—'তার মানে?'

—'আরে সেই বলটার কি হল? আকাশে ত' উড়ে গেল।'

—'ও, সেই ফুটবলের কথা বলছেন? আরে সে ত' আর নামলোই না!'

জাহাজডুবি

আমাদের সকলের চোখ বড় বড় মার্বেলের গুলির মতো হয়ে গেল। ডিপিবাবু দেখলেন, বুঝলেন। তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন,— 'ওঃ হো, দেখেছ কাণ্ড! পাঁচটা বেজে গেছে। আমাকে আবার 'অল ওয়ার্ল্ড ক্যাকটাস এ্যাসোসিয়েসনে'র মিটিং-এ সভাপতিত্ব করতে হবে'—এই কথা বলেই ডিপিবাবু হনহন করে ট্রামরাস্তার দিকে এগোলেন।

———

সত্যব্রত রায়

আমার বন্ধু শ্রীপরাশর সরখেল মহাশয়ের পরিচয় প্রথমে দিয়ে রাখি। শ্রীসরখেল একটি মার্চেন্ট অফিসের বড়বাবু। মোটা থপথপে নিরীহ, শান্ত ভদ্রলোক। কোন সাতপাঁচে থাকেন না। অফিসের ছুটির পর বাড়ী ফিরে জ্যোতিষ-চর্চ্চা করেন। বিশেষ করে হাতদেখাই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কাজ। মাসের শেষে অর্থের অনটন দেখা দিলে আবালবৃদ্ধবণিতা তাঁকে দিয়ে হাত দেখাত। এই সব কারণে বন্ধুবর শ্রীপরাশর সরখেল তাঁর অফিসে, পাড়ায় ও আত্মীয়স্বজনের কাছে বিশিষ্ট জ্যোতিষীরূপে খ্যাতিলাভ করেছেন। এঁড়েদা'র নিখিল ভারত জ্যোতিষ মহাসঙ্ঘ তাঁকে 'ভবিষ্যৎ-চক্ষু' উপাধি দিয়েছে। আমার কোনদিনই জ্যোতিষ-তত্ত্বে বিশ্বাস নেই। অথচ প্রত্যেক মাসেই পনের তারিখের পর আথিক টানাটানিতে কাতর হয়ে অর্থভাগ্য জানার জন্য এঁড়েদার শ্রীপরাশর সরখেল মহাশয়ের কাছে যেতাম।

সে যাইহোক, কালের বিধানে একদিন পরাশরবাবুর তুঙ্গী বৃহস্পতি বক্রী হল। দুর্ভাগ্য নেমে এল। তাঁর কোম্পানীর মালিকপক্ষ ব্যবসার পাট গুটিয়ে সাগরপারে চলে গেল। শনির করাল ছায়া ঘনাল। শ্রীসরখেল অশ্রুজলে স্নান করলেন।

পঞ্চাশোর্ধ এই ভদ্রলোক সেদিন আমার হাতধরে কেঁদে বললেন,—'বেস্পতির বক্রদৃষ্টি আর শনির ক্রুরদৃষ্টি পড়ে সব খুইয়েছি। এখন কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে খাব কি?'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম,—'ভয় কি সরখেলবাবু! বেস্পতি ত' চিরকালই

বাঁকাভাবে তাকাবে না, একদিন ত' সোজা হবে। তখন সব ভাল হয়ে যাবে।'

সরখেলবাবু বললেন,—'আমার বেস্পতি ত' তালা ঝুলিয়ে ইংলণ্ডে চলে গেছে। আর ত' ফিরবে না। আমার বেস্পতি অস্ত গেছে মশাই, অস্ত গেছে।'

আমি সহানুভূতির সঙ্গে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম,—'আপনি কাঁদবেন না সরখেলবাবু!'

—'কাঁদবো না মশাই! এখনও এককড়ি ম্যাট্রিক পাশ করেনি, চন্দনার বিয়ে হয়নি, সেই কবে গিন্নীর দাঁত পড়েছে, এখনও বাঁধানো হয়নি। কাঁদবো না?'

ভেবে দেখলাম কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ মালিকপক্ষ ত' সত্যই চলে গেছে। আর আসবে না। ইনি মোটা থপথপে ভুঁড়ি-সর্বস্ব বুড়োমানুষ। হাত দেখে একটু প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন বটে, কিন্তু তেমন লম্বা ডিগ্রী ত' তাঁর নেই। কোথায়ই বা যাবেন?

শ্রীসরখেল আমার হাতধরে বললেন,—'যাহোক একটা উপায় আমাকে বলুন।'

হঠাৎ একটা উপায় ভেবে ফেললাম। বললাম,—'কে বলল আপনার বেস্পতি অস্ত গেছে, আপনার বেস্পতি ত' আপনার হাতে। মশাই, বড়রাস্তার ধারে একটি জ্যোতিষ-আশ্রম খুলুন। হাত দেখেই ত' প্রচুর টাকা রোজগার করতে পারবেন।'

আমার কথাগুলি পরাশরবাবুর মর্মস্পর্শ করল। তিনি বললেন,—'বেশ কথা, ভাল কথা। এত অনায়াসেই হতে পারে।

পরাশরবাবু আর পাঁচজন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে পরামর্শ করলেন। সকলেই এ প্রস্তাবে সানন্দে সায় দিলেন।

দিনসাতেক পরে বড়রাস্তার ধারে একটি বড় ঘরের মাথায় নূতন সাইনবোর্ড দেখা দিল। সাইনবোর্ডের ওপরে একটি হাতের ছবি। তার নীচে বড় বড় হরফে লেখা,—

পামিষ্ট্রি-হোম

জ্যোতিষসম্রাট শ্রীপরাশর জ্যোতিঃশিরোমণি ভবিষ্যৎ-চক্ষু

ইতি হাত দেখিবামাত্র ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলিয়া
দেন। আমেরিকা, রাশিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স চীন জাপান
হল্যাণ্ড, কেনিয়া-টাঙ্গানিকা ও হনলুলু হইতে লক্ষাধিক
প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত।

সাইনবোর্ডের বিষয়বস্তু নিয়ে পরাশরবাবু আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু এই সাইনবোর্ডের নীচে আর একটি লম্বা সাইনবোর্ড ঝোলান ছিল। এই লম্বা সাইনবোর্ডটি পরাশরবাবুর স্বকপোলকল্পিত। এখানে কতকগুলি কবচের নাম লেখা ছিল। তালিকা একটু দীর্ঘ হলেও, আপনাদের জ্ঞাতার্থে পুরোপুরি উদ্ধৃত করছি,—

ক্ষুরধার কবচ—যে সকল ছাত্র-ছাত্রীর মাথা ভাঙ্গিলেও একটু বুদ্ধি বাহির হয় না, সেইসকল গর্দ্দভ-গর্দ্দভী সদৃশ ছাত্র-ছাত্রীদের এই কবচ ধারণ করাইলে অঙ্কে একশতের মধ্যে একশতই পাইবে।

পদোন্নতি কবচ—এই কবচ ধারণে তেল না দিয়াও চাকুরীতে প্রমোশন পাওয়া যায়।

পদোন্নতি কবচ (স্পেশাল)—ইহা ধারণ করিলে যেকোন পাষাণ-হৃদয় সাহেবও একেবারে গলিয়া গিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে ধাপে ধাপে প্রমোশন দেন।

কুচক্র-শান্তি কবচ—আপনার কর্মস্থলে যে সকল ঘোরপ্যাঁচ প্রিয় অসভ্য সহকর্মীগণ ক্রমাগত 'চুকলি' প্রদান করিয়া আপনার বিরুদ্ধে 'বস্' ক্ষেপাইতেছে, এই কবচ ধারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সর্পের সম্মুখে ভেকের ন্যায় ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া যাইবে।

অর্থোন্নতি কবচ—ইহা ধারণের সঙ্গে সঙ্গে ভেল্কিবাজীর ন্যায় আর্থিক দুশ্চিন্তা দূর হইবে। ক্যাশবাক্সে মা লক্ষ্মী অচলা হইয়া হাস্য করিবেন।

বোম্-কবচ—ইহা ধারণ করিলে রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করিবার সময় বোমাঃ ঘায়ে মারিবার সম্ভাবনা নাই।

জাহাজডুবি

ধনাঢ্য কবচ—এই কবচ ধারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে পকেট গরম হইয়া যায়। টাকা খরচ করিয়াও শেষ করা যায় না।

ঐ (একষ্ট্রা ষ্ট্রং)—এই কবচ ধারণ করিলে ক্রমাগত লটারীর প্রথম পুরস্কার পাইতে পাইতে বিড়লার ন্যায় ধনী হইবেন। যাঁহারা দূরে আছেন তাঁহারা এই কবচের জন্য টাকা 'মনি-অর্ডার' করার সঙ্গে সঙ্গেই ফল পাইতে থাকিবেন।

উপঢৌকন কবচ—যাহাদিগের চাকুরীতে ঘুষ ও উপড়ি আছে, তাঁহারা এই কবচ ধারণ করিলে প্রচুর পরিমাণে ঘুষ খাইয়া সংসার আলোকিত করিতে পারিবেন।

সত্যি, সরখেলবাবুর দূরদৃষ্টি আছে। এঁড়েদার নিখিল ভারত জ্যোতিষ মহাসঙ্ঘ সাধে কি তাঁকে 'ভবিষ্যৎ-চক্ষু' আখ্যা দিয়েছে?

জ্যোতিষসম্রাট আমাকে বললেন,—কেমন হয়েছে?

আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে বললাম,—অপূর্ব। হাত ত' ভালই দেখেন, তার ওপর এমন সুন্দর সুন্দর কবচ! আপনার বৃহস্পতি এবার তুঙ্গী ত'?

পরাশরবাবু জুলপি চুলকাতে লাগলেন।

আমি বললাম,—'আপনি ত' হাত দেখতেই জানতেন, কিন্তু এমন চমৎকার হরেকরকম কবচ তৈরী কবতে পারতেন তা ত' জানতাম না।'

ঘরে আরও দু' একজন লোক থাকায় পরাশরবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বাঁ চোখটি ঈষৎ নিমীলিত করতেই আমি চুপ করলাম।

পরাশরবাবু বললেন,—রোজ সন্ধ্যায় আসবেন। ফাঁক পেলে গল্প করা যাবে।

আমি প্রতিদিন যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলাম।

'পামিষ্ট্রি হোম-এর ঘর বেশ পরিপাটি করে সাজানো হয়েছে। প্রথমে ঝকঝকে চেয়ার টেবিল। টেবিলের উপর একটি পিতলের ফলক, তাতে লেখা আছে 'রিসেপসনিস্ট'। পরাশরবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র এককড়ি সেখানে বসে। ঘরের

মাঝখানে সোফাসেট। ঘরের শেষপ্রান্তে একটি তক্তপোষের ওপর গালিচা পাতা। খাটের ওপর একটি ডেস্ক, তার ওপর টেবিল ল্যাম্প। বাঘছালের আসনে বসে আছেন রুদ্রাক্ষের মালা পরিহিত জ্যোতিষসম্রাট পরাশর সরখেল ভবিষ্যৎচক্ষু। জ্যোতিষসম্রাটের আসনটি একটি পর্দা ঝুলিয়ে আড়াল করা হয়েছে। ভেবে দেখলাম সময় কাটাবার পক্ষে স্থানটি মন্দ নয়। পর পর কয়েকদিন গিয়ে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করলাম।

পামিষ্ট্রি-হোমে প্রথমেই এলেন এক মধ্যবয়সী উদভ্রান্ত ভদ্রলোক। প্রায় ছ' ফুট লম্বা। চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। রোগা লিকলিকে শ্যামবর্ণ এই ভদ্রলোকের নাম পীতাম্বর হালদার। শ্রীমান এককড়ি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। তাঁকে দক্ষিণার কথার কথাও জানান হল। একটি প্রশ্ন পাঁচটাকা, দু'টি প্রশ্ন দশটাকা, তিনটি প্রশ্ন একত্রে বার টাকা। আর ১৭·৫০ পয়সা দিলে মোটামুটি সবকিছুই বলা হবে। পীতাম্বরবাবু বিনা বাক্যব্যয়ে ১৭·৫০ দক্ষিণা দিলেন।

আমি তাঁকে জ্যোতিষসম্রাটের কাছে নিয়ে গেলাম। জ্যোতিষসম্রাট পরাশর ধ্যানস্থ হলেন। সিংহনাদ তুলে বললেন,—'হরি ওঁ তৎসৎ।' তারপর ড্রয়ার খুলে 'ম্যাগনিফাইং গ্লাস' বের করলেন। কাপড়ের একপ্রান্ত দিয়ে সেটাকে পরিস্কার করতে করতে বললেন,—'আপনার হাতটা দেখি!'

পীতাম্বরবাবু হাত দেখাবার আগেই ডুকরে কেঁদে উঠলেন,—'বাবা, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। এত করে পাঁচুকে মানুষ করলুম, রক্ত-জল-করা টাকায় খাওয়ালুম পরালুম, বৌয়ের গয়না বেচে এক সাহেবকে ঘুষ দিয়ে চাকরী ঠিক করে দিলম অথচ সে কিনা—'

জ্যোতিষসম্রাট বললেন,—কে সে? কি করেছে সে?

পীতাম্বরবাবু বললেন,—'আজ্ঞে পাঁচু. আমার ছেলে—শেষপর্যন্ত হতভাগা আমার মুখে চুণকালি দিয়ে, আমার ভবিষ্যতের আলো নিভিয়ে সরে পড়েছে। যাবার আগে হারামজাদা এই চিঠি লিখে গেছে।'—বলেই পীতাম্বরবাবু ফতুয়ার পকেট থেকে একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি বার করলেন। চিঠিতে লেখা ছিল,—

মাইডিয়ার বাবা,

পই পই করে তোমায় বলেছিলাম পাশের বাড়ীর পদ্মীকে বিয়ে করব। কিন্তু যতবারই তুমি একথা শুনেছ, ততবারই বলেছ,—'হারামজাদা উল্লুক!

জুতো মেরে সাতহাত লম্বা করে দেব। তাই শেষপর্যন্ত ভেবে দেখলাম, 'আরে দূর মশায়, অত ভাবতে গেলে চলে না। এসব ব্যাপারে একটু সাহসী হতে হয়।' তাই পদ্মীকে বিয়ে করে নূতন জীবন শুরু করলাম। খামাখা খোঁজাখুঁজি করে আমাদের জীবন বরবাদ করে দিও না। ইতি পাচু

চিঠি পড়া শেষ হলে পীতাম্বরবাবু আবার কেঁদে উঠলেন। বললেন,— 'দেখলেন বাবাজী! ছোটবেলা থেকে হিন্দী সিনেমা দেখে দেখে আজকালকার ছেলেমেয়েদের কী অবস্থা হয়েছে!'

জ্যোতিষ সম্রাট বললেন,—'হুম্! হাতটা এগিয়ে দিন তো!' পীতাম্বরবাবু হাতটা এগিয়ে দিলেন। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে হাতটা দেখতে দেখতে জ্যোতিষ সম্রাট বললেন,—'গোড়া থেকেই আপনার সন্তানস্থান খুব খারাপ যাচ্ছে।'

পীতাম্বরবাবু বললেন,—'হাঁা হ্যাঁ, ঠিক তাই! সেইজন্যই ত আসা।'

আবার জ্যোতিষীমশাই বললেন,—আপনার হাতের ঝাঁটা-ঝাঁটা রেখা থেকে বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারছি বহুকাল যাবৎ সংসারে ঝাঁটার বাড়ীই খাচ্ছেন! বর্তমানে আপনার বৃহস্পতি লুকিয়েছে, তার ওপর শনি-মঙ্গল-রাহু-কেতু আপনাকে একেবারে কাৎ করে ফেলেছে। তার জন্য ঘাবড়াবেন না। আপাতত আমি আপনাকে একটা শিকড় দিচ্ছি। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সূর্যপ্রণাম করে এই শিকড়ের কিয়দংশ বেঁটে কাঁচা দুধ দিয়ে চটকে 'নৃসিংহ মূর্তি' স্মরণ করতে করতে কপ করে খেয়ে ফেলবেন। খাওয়ার শেষে হরিনাম করবেন। এইভাবে পনের দিন করার পরেও যদি না আসে তাহলে আপনাকে 'মেষকরণ মাদুলী (স্ট্রং)' তৈরী করে দেব। বাড়ী ফিরে দেখবেন সস্ত্রীক পাঁচু আপনার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছে।

পীতাম্বরবাবু জ্যোতিষ সম্রাটকে প্রণাম করে ফিরতেই দেখলেন আর এক ভদ্রলোক আসছেন। বেঁটে মোটা গোলগাল চেহারা। আর কি আশ্চর্য! দু'জনই দুজনকে দেখে রেগে আগুন হয়ে গেলেন। দুজনের অগ্নিদৃষ্টিই পরস্পর নিবদ্ধ। দুজন একই সঙ্গে চিৎকার করে বললেন,—'চোপ'!

কিন্তু আমাদের পীতাম্বরবাবু লজ্জিত হয়ে বিদায় নিলেন। আগন্তুক ভদ্রলোকের নাম ঘনশ্যাম বড়াল। ঘনশ্যামবাবু ১১·৫০ পয়সা দিয়েই হাত

দেখাতে এসেছেন। তিনিও কেঁদে ফেললেন। বললেন,—'বাবাজী, ওই যে পীতাম্বর-রাস্কেলটা এইমাত্র চলে গেল, তার ছেলে পাঁচুর সঙ্গেই ত আমার পদী পালিয়ে গেছে। মেয়েটা বড়াল-বংশের মুখে একেবারে চুণ-কালি মাখিয়ে দিয়েছে। এই দেখুন—' বলেই ঘনশ্যামবাবু তাঁর পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটি চিঠি বার করে পড়তে লাগলেন,—

শ্রীচরণেসু বাবা,

আমরা অবলা জাত, তা বলে গরু-ভেড়া ত নই যে, যে খুঁটোয় বাঁধবে সেখানেই ঘাস খাব। মুখফুটে ত বলতে পারি না, তাই লজ্জার মাথা খেয়ে কয়েকবার চিরকুট লিখে তোমার পাঞ্জাবীর পকেটে রেখে এসে জানাতে চেয়েছি যে পাঁচুদাকেই আমি বিয়ে করব। তুমি যতবারই সেই চিঠি দেখেছ ততবারই বলেছ,—'মুখপুড়ী পোড়ারমুখী হারামজাদী! ছদিন কো-এডুকেশন কলেজে পড়েই এই! মাথা ন্যাড়া করে চিটেগুড় মাখিয়ে কলেজের সামনে ঘুরিয়ে আনব।' তাই অনেক দুঃখেই মাথার চুল বজায় রেখে বিদায় নিলাম।

ইতি পদী

জ্যোতিষসম্রাট বললেন,—'কই! হাতটা দেখি ঘনশ্যামবাবু। ঘনশ্যামবাবু হাতটা এগিয়ে দিলেন। আতসকাঁচ দিয়ে দেখতে দেখতে জ্যোতিষসম্রাট বললেন,—'আপনার কন্যাস্থানে অশুভ শুক্র ও চন্দ্র ঝাঁঝালো হয়ে এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে। তবে বৃহস্পতি স্থান উঁচু এবং জমাট হওয়ায় কন্যা বিবাহের অযথা অর্থব্যয় বেঁচে গেছে। আপনার ভাগ্য অতীব শুভ। জামাই এবং জামাই-এর বাবা যাতে ভবিষ্যতে আপনার শারীরিক ক্ষতিসাধন না করতে পারে, তারজন্য আমি একটি 'বোম্ কবচ' (একস্ট্রা স্ট্রং) দেব। শান্তি হবে।'

ঘনশ্যামবাবু নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন। 'পামিষ্ট্রী-হোম' সেদিনকার মত বন্ধ হয়ে গেল।

পরদিন আবার সেই আড্ডায় গেলাম। সন্ধ্যা সাতটায় একজন লম্বা-চওড়া গুরুগম্ভীর লোক এলেন। পরনে সুট, আগাগোড়া টিপটপ। নাম মিস্টার ডি. জি. মিটার (পিতৃদত্ত নাম সম্ভবত দোলগোবিন্দ মিত্র)। এককড়ির কাছে ফি জমা দিয়ে এগিয়ে এলেন। আমি সসম্ভ্রমে তাঁকে সরখেলবাবুর কাছে নিয়ে গেলাম।

জাহাজডুবি

শ্রীসরখেল যথারীতি সিংহনাদ ছেড়ে বললেন,—'হরি ওঁ তৎসৎ।' মিস্টার মিটার গম্ভীর হয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। একটা কথাও বললেন না। কেন এসেছেন জানার কোন উপায় রইল না।

জ্যোতিষসম্রাট শ্রীপরাশর সরখেল ভবিষ্যৎ-চক্ষু চেহারায় মোটা থপথপে হলেও আসলে অত্যন্ত ধূর্ত্ত। তিনি আতসকাঁচের ভিতর দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললেন,—'আপনার মত লোক হয় না। অথচ সকলেই আপনাকে ভুল বোঝে।'

মিস্টার মিটার গম্ভীর বনেদী গলায় বললেন,—রাইট রাইট!

উৎসাহিত হয়ে জ্যোতিষসম্রাট বললেন,—'এখন আপনার সময় ভাল নয়। মানসিক আঘাতের ধাক্কা সামলাতে না পেরেই আপনি আমার কাছে এসেছেন। বলুন তো ঠিক কিনা?'

মিস্টার মিটার—এগজাক্টলি! আমি 'বনোয়ারীলাল চনোরিয়া গ্রাইণ্ডিং মেশিন ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেডে'র জেনারেল ম্যানেজার। কয়েকজন কর্মচারী দাবী জানিয়েছিল, কোন কর্মচারীকে 'চার্জসীট' দিতে গেলে তাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে তার অনুমতি নিয়ে তবেই চার্জসীট দিতে হবে। আমি এ দাবী মেনে নিইনি। তাই ওরা আমাকে তিনদিন ঘেরাও করে রেখেছিল। আজ আমার বাংলোর কাচের শার্সীগুলি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে আর বলেছে,—

'আমাদের দাবী মেনে নাও
না হয় বোমায় নিপাত যাও।'

তাই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

জ্যোতিষসম্রাট শ্রীসরখেল বললেন,—'হুঁ আপনার ঝঞ্ঝাট রেখা মান-সম্ভ্রম রেখাকে চিরে রাহু ও কেতুর ওপর কুণ্ডলী পাকিয়েছে। তাই সবকিছু উত্তম হওয়া সত্ত্বেও আলটপকা ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়।

মিস্টার মিটার বললেন,—'এর কি কোন প্রতিকার নেই?'

শ্রীসরখেল বললেন,—না, প্রতিকারে ফল হবে না। কারণ রাহু বেঁকে বসায় ওরা হয়ত পটকা ছুঁড়তে পারে। আপনি ওদের দাবী মেনেই নিন। তবে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আপনি একটা মহাশক্তিশালী 'দমন যন্ত্র' ধারণ করে দেখতে পারেন।

সত্যব্রত রায়

মিটার সাহেব বিদায় নিলেন।

একটি করে দিন যায় আর নূতন নূতন অভিজ্ঞতা বাড়ে। পরদিন আর এক নূতন অভিজ্ঞতা হল। এক শীর্ণকায় গোবেচারী ভালমানুষ শ্রীহরিহর পোদ্দার এলেন। দেখেই মনে হয় নানা অশান্তিতে মৃত্যুর দিন গুণছেন। তাঁর হাত দেখতে দেখতে জ্যোতিষসম্রাট বললেন,—'অশান্তি ঘটেছে ত?'

—আজ্ঞে হ্যাঁ—শ্রীপোদ্দারের ক্ষীণকণ্ঠের জবাব।

—সময়টা আপনার খুবই খারাপ। পারিবারিক অশান্তি ত নিশ্চয়ই ঘটেছে. কি বলুন।

জ্যোতিষসম্রাটের অলৌকিক শক্তিতে শ্রীপোদ্দার থ' হয়ে গেলেন। বললেন, —বাবাজী, চাকরী বাকরীর অশান্তি ত' চিরকালই আছে। সারা মাস খেটে একশ পঁচাত্তর টাকা একচল্লিশ নয়া মাইনে পাই। তাই দিয়ে স্ত্রী ও তিনটি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে কষ্টেসৃষ্টে দিন চালাই। তায় গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত একটি ইয়ং গ্র্যাজুয়েট ছেলে এসে জুটল। তারসঙ্গে কথা ছিল যে সে আমার বাড়ীতে থাকবে আর আমি আমার সাধ্যমত তাকে ডাল-ভাত-পটলভাজা-তেঁতুলের অম্বল—যা পারি তাই খাওয়াব। বিনিময়ে আমার ছেলে তিনটেকে একটু পড়িয়ে দেবে। কিন্তু—

—কিন্তু কি? বলুন শেষপর্যন্ত কি হল?

—কি আর হবে? আমার ঐ যমের অরুচি মতিচ্ছন্না সতীর ঘেন্না স্ত্রী তিন তিনটে বাচ্চাকে রেখে ওই ইয়ং ছেলেটার সঙ্গে পালিয়ে গেছে।

জ্যোতিষসম্রাট পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে হাতের রেখাগুলি নিরীক্ষণ করে বললেন,—'হুঁ, আপনার হাতের রেখাই ত' বলছে কুলটা নারীর সঙ্গে বিবাহযোগ। বিয়ের আগে হাতটা কাউকে দিয়ে একটু দেখিয়ে নিতে পারেন নি? কিংবা এই ঘটনার আগে আপনার স্ত্রীকে একটা 'কুলরক্ষা মাদুলী' ধারণ করিয়ে দিলেই ত কুলরক্ষা পেত।'

শ্রীপোদ্দার কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন.—এখন আমি কি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলব,—'ওগো তোমার পায়ে পড়ি, ফিরে এস।'

—না না না। যে চলে গেছে সে আর ফিরবে না। তাছাড়া অপরের এঁটো খাওয়া কি ভাল? কক্ষণো ওকে ফেরাবেন না। ফিরতে চাইলে

জুতিয়ে ভাগিয়ে দেবেন।

—কিন্তু আমার কি হবে?

—কি আর হবে? আপনি আবার বিয়ে করুন। গরীবের মেয়ে। দেখবেন কনে যেন বয়স্কা কালো মিশমিশে ও দজ্জাল প্রকৃতির হয়।

—ওরে বাবা! আমি একে তিনছেলের বাপ, মাথাভর্তি টাক, পাকা জুলপি, তারওপর এমন হাড় জিরজিরে চেহারা—খালিগায়ে ত' দেখেন নি?—মনে হবে পাঁজরার হাড় কখানা যেন সিমেণ্ট দিয়ে গাঁথা। তায় আবার দজ্জাল বৌ এলে ত একটার পর একটা হাড় পট পট করে খুলে নেবে।

—তা হোক। আপনি আজই ঘটকের কাছে যান। আপাততঃ আমি আপনাকে এই পুরিয়া দিলাম। এই পুরিয়া মধ্যস্থ সিন্দুর ১৫০ গ্রাম ধুনার সঙ্গে মিশিয়ে পরপর পাঁচদিন সন্ধ্যায় জ্বলন্ত ধুনুচিতে ঐ মিশ্রিত ধুনা ফেলতে ফেলতে বলতে হবে,—'যে নারী আমার কুলে কলঙ্ক লেপন করেছে সে পঙ্কে নিমজ্জিত হোক। আমার পরিকল্পিত স্ত্রী ঘরে আসুক।' ব্যস, এতেই শান্তি হয়ে যাবে।

হরিহর পোদ্দার বিদায় নিলেন।

নানা ঝামেলায় চার পাচ দিন আমি পামিষ্ট-ভবনে যেতে পারিনি। কিন্তু হরখেলবাবুর তাগিদে আবার গেলাম। এই সন্ধ্যায় একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক শ্রীরামরাজা ভাট এলেন। এক নজরেই বোঝা যায় অতীব সরল নিষ্পিবাদী ভালমানুষ—এককথায় ব্যোম-ভোলা।

ভদ্রলোক এককড়ির সঙ্গে অনেকক্ষণ দামদর করলেন। কিন্তু কোন ফল না হওয়ায় একটি প্রশ্নের জন্য পাঁচটাকা জমা দিলেন। যথারীতি জ্যোতিষী-মশায়ের সামনে হাত বাড়ালেন।

ভবিষ্যৎ-চক্ষু জিজ্ঞাসা করলেন,—বলুন কি আপনার প্রশ্ন?

—আমি বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি পাব কি?—শ্রীভাট জবাব দিলেন।

—আহা ওভাবে বললে কি হয়? বর্তমান কোন অবস্থা সেটা বলুন।

শ্রীভাট বললেন,—মানে বর্তমান আর্থিক অনটন থেকে মুক্তি পাব কি?

জ্যোতিষসম্রাট—কতদিন ধরে এই অনটন চলছে?

—আজ্ঞে, দুবছর এগার মাস আঠার দিন।

—এই অনটনের জন্য দায়ী কে?

—আজ্ঞে, আমারই ভাই।

জ্যোতিষসম্রাট ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করতে করতে বললেন,—ব্যাপারটা কি হয়েছিল?

আজ্ঞে, ওর জন্যই আজ না খেয়ে মরছি, নিজের সহোদর ভাই হয়ে—

—সেই কথাই ত জিজ্ঞেস করছি, সহোদর ভাই কি করেছে?—বলেই জ্যোতিষ সম্রাট রামরাজাবাবুর আঙুলের গাঁট টিপে টিপে দেখতে লাগলেন।

রামরাজাবাবু বললেন,—ব্যাপারটা কি হয়েছিল জানেন? আমি একজন সরকারী কর্ম্মচারী। ২/৩ বৎসর আগে আমার ভাই গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে পনের হাজার টাকা 'লোন' নেয়। আমি তার জামিন হই। ভাই আমার সেইসব টাকা মেরে নিজের আখের গুছিয়ে বসেছে। গভর্ণমেণ্ট ওকে তিন-চারটে চিঠি দেয়। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে আমার মাইনে থেকে কেটে নিচ্ছে। আমি মাইনে পেতাম তিনশ' উননব্বই টাকা পাঁচ নয়া (৩৮৯·০৫) আর প্রায় তিন বছর যাবৎ মাইনে পাচ্ছি শুধু একান্নটাকা একনয়া (৫১·০১) করে।

জ্যোতিষসম্রাট বললেন—আর কতদিন ওরা মাইনে কাটবে?

শ্রীভাট বললেন কি জানি! আরও বছর দেড়েক হয়ত! তবে গভর্ণমেণ্টের ব্যাপার ত জানেন? যতদিন চাকরি করব ততদিন কেটেই যাবে। রিটায়ার করার পর এম-এল-এ, মিনিস্টার, রাজ্যপালকে ধরে আদায় করে নিতে হবে।

জ্যোতিষসম্রাট বললেন,—ও, এই ব্যাপার! ঘরে আর কে কে আছে?

—আজ্ঞে, বৌ ছেলেমেয়ে সবাই আছে।

—আহা কজন?

—আজ্ঞে, বৌ আর পাঁচটি মেয়ে।

—কি করে চলছে?

—আজ্ঞে, চলছে না।

—ও! দেখুন রামরাজাবাবু, আপনার হাতের রেখাগুলি দেখে আমি যা বুঝতে পারছি, বিশেষ চিন্তা না করে আপনার কাউকেই টাকা ধার দেওয়া উচিৎ নয়। দেড়বৎসরাধিককাল আপনার এরূপ অনটন চলবে। ততদিন

জাহাজডুবি

স্ত্রী-কন্যা সহ ওই শঠ ভাতৃগৃহেই অবস্থান করতে হবে। কারণ আপনার আয়স্থানে শনির কুদৃষ্টি ত' পড়েছেই, তার ওপর কেতু একেবারে বিষদাঁত বসিয়ে দিয়েছে। ভাতৃগৃহে যাতে আপনার অশান্তি না হয়, তারজন্য একটি 'স্বজন শান্তি' কবচ এবং সুদসমেত টাকা শোধ হওয়ার পর যাতে আর টাকা না কাটে সেজন্য বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের বশীভূত করার মোক্ষম যন্ত্র 'সরকার শান্তি' মাদুলী ধারণেই সব শান্তি হয়ে যাবে।

শ্রীরামরাজা ভাট ঝুঁকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন।

জ্যোতিষসম্রাট পরাশর সরখেল ভবিষ্যৎচক্ষু বেশ জমিয়ে বসেছেন। চাকরীর আয়ের চেয়ে অনেক বেশী আয় হচ্ছিল তাঁর। আমি বললাম,—'কি মশাই, আপনার বৃহস্পতি নাকি ইংলণ্ডে চলে গেছে? বেশ ত জমিয়ে বসেছেন। এত রোজগার এর আগে কখন কল্পনা করেছিলেন?'

জ্যোতিষসম্রাট বললেন,—তা বটে কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যে অস্তমিত বৃহস্পতি কি করে ক্যাশবাক্স আলো করছেন?

বহিরাগতের কথার শব্দে দুজনেই চুপ করে গেলাম। এবার শ্রীভবভূতি মাইতি নামে একজন ভদ্রলোক এলেন। সৌম্য শান্ত সুপুরুষ চেহারা। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। গায়ে একটি ঘিয়ে রঙের শাল জড়ানো। সঙ্গে আর এক ভদ্রলোক শ্রীমাইতির পিঠে হাত রেখে এগিয়ে আসছেন। সৌম্যকান্তি শ্রীমাইতিকে ঘিয়ে রঙের শাল জড়ানো অবস্থায় বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল।

শ্রীমাইতি জ্যোতিষসম্রাটের সামনে গম্ভীর হয়ে বসলেন। জ্যোতিষসম্রাট ম্যাগনিফাইং গ্লাস বার করে বললে,—'কই হাতটা দেখি?'

শ্রীমাইতি চুপ করেই রইলেন। তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে জ্যোতিষ-সম্রাট বললেন,—কই মশাই, হাতটা দেখান।

শ্রীমাইতি শান্ত দৃষ্টিতে জ্যোতিষসম্রাটের দিকে তাকিয়ে, একটুও দ্বিধা না করে তাঁর ডান পা বাড়িয়ে দিলেন। জ্যোতিষসম্রাট ও আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এ কোন ভদ্রবেশী ছোটলোক? এ কোনদেশী রসিকতা?

জ্যোতিষসম্রাট চিৎকার করে উঠলেন,—'এ আবার কোনদেশী বেলেল্লাপনা?

শ্রীমাইতির মুখচোখের কোন পরিবর্তন হল না। তিনি ডান পা বাড়িয়ে পূর্ববৎ সৌম্যমুখে বসে ছিলেন। এবার আর জ্যোতিষসম্রাটের বুঝতে কোন

অসুবিধাই হল না যে লোকটা বদ্ধ পাগল। তাই তিনি মৃদু হেসে বললেন,—'পা বাড়ালেন কেন ভাই? হাত বাড়ান।'

শ্রীমাইতি মৃদু হেসে বললেন,—'হাত ত নেই! গেলবছর ট্রেন দুর্ঘটনায় দুটো হাতই হারিয়েছি। পা ছাড়া দেখাবার ত কিছুই নেই।'

জ্যোতিষসম্রাট শ্রীপরাশর সরখেল ভবিষ্যৎ-চক্ষু একেবারে পাথরের মত নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। তাঁর চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। আমারও কানদুটো দিয়ে গরম ভাপ বেরোতে লাগল। শ্রীমাইতি স্মিতহাস্যে বসে রইলেন। ভারী মুস্কিলে পড়া গেল। এখন কি হবে? হঠাৎ এক প্রচণ্ড শব্দে সব মুস্কিলের অবসান হল। জ্যোতিষসম্রাট মেঝেয় পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আমি সেই হাতবিহীন ভদ্রলোককে বিদায় নিতে বললাম।

প্রায় তিনঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে থাকার পর জ্যোতিষসম্রাট উঠে নির্ব্বাক অবস্থায় বাড়ী ফিরলেন। আপনারাই বলুন পৃথিবীর আর কোনও জ্যোতিষসম্রাট কি কখনো এই অবস্থায় পড়েছেন?

যাইহোক, পরদিন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম,—"জ্যোতিষসম্রাট শ্রীপরাশর সরখেল ভবিষ্যৎচক্ষু সশিষ্য কাশী যাইতেছেন। পুনরায় নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত 'পামিষ্ট্রি-হোম' খুলিবে না।"

তাহলে জ্যোতিষশাস্ত্র একেবারে মিথ্যা নয়। পরাশরবাবুর বৃহস্পতি সত্যি সত্যিই ইংলণ্ডে চলে গেছে।

একটি করুণ প্রেমের কাহিনী

করুণ প্রেমকাহিনী অনেক শুনেছি। পবিত্র প্রেমের ওপর নিষ্ঠুর নিয়তির প্রভাবের কথা অনেক পড়েছি। আপনারা করুণ মধুর প্রেমের কথা গল্পে উপন্যাসে পড়েছেন। কিন্তু আমি যে গল্প আপনাদের শোনাতে চাই ঠিক এই ধরনের ট্র্যাজেডী, এমন মর্মভাঙা বিচ্ছেদের ঘটনা বোধহয় আপনারাও শোনেন নি।

গল্পটি আমার বন্ধুকে নিয়ে। বন্ধু রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কলকাতার এক মার্চেন্ট-অফিসের কর্ম্মী। ওদের বাড়ীতে মাত্র দুজন প্রাণী। রমা ও তার মা। রমা কিছুদিন যাবৎ অনুভব করছিল, ও বড় একলা। ভরা যৌবনে এমন একাকিত্বের জ্বালা যেন আর সহ্য হয় না। তাই মন একজন সঙ্গিনী চায়,—নিদেন পক্ষে বান্ধবী।

একদিন সন্ধ্যায় রমাপ্রসাদ আর আমি চা খেতে খেতে নানা আলোচনা করছিলাম। ধীরে ধীরে ওর একাকিত্বের কথা উঠল। রমা বলল,—'স্বাথ' লোকের একটা বান্ধবীও থাকে, আমার তাও নেই!'

খবরের কাগজ পড়তে পড়তে জবাব দিলাম,—'তা বটে!'

রমা আবার বলল,—'এমন একটা লোকের দরকার, যার কাছে দুটো মনের কথা বলতে পারি।'

খবরের কাগজে পেন-ফ্রেণ্ডশিপের একটা বিজ্ঞাপন দেখে চমকে উঠলাম। ইউরেকা, ইউরেকা! রমাকে বিজ্ঞাপনটা পড়িয়ে শোনালাম,—"যাঁরা পেন-ফ্রেণ্ডশিপ অর্থাৎ চিঠিতে বন্ধুত্ব করতে চান তাঁরা নিঃসঙ্কোচে আমাকে

সত্যব্রত রায়

লিখতে পারেন।

লক্ষ্মী বন্দ্যোপাধ্যায়
পোঃ শান্তিনিকেতন
জেঃ বীরভুম

বিজ্ঞাপন পড়ে রমার মুখখানা কি এক অজানা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আমি বললাম,—'ব্যস্, এবার শুরু করে দাও। চমৎকার এক বান্ধবী পেয়ে গেলে :'

রমাও চিৎকার করে উঠল,—'দি আইডিয়া!'

এরপর শুরু হল চিঠিতে মন দেওয়া-নেওয়ার পালা। সে এক অতলস্পর্শী গভীর নিবিড় নিখাদ প্রেম। রমা প্রথম চিঠিখানি আমাকে দেখিয়েছিল। প্রথম চিঠিতে লেখা ছিল,—

মাইডিয়ার লক্ষ্মী,

আমি বহুদিন ধরেই তোমার মত একজনকে খুঁজছিলাম। কাগজে দেখে আর থাকতে পারলাম না। ব্যস্ত হয়ে চিঠি লিখছি। তোমাকে 'তুমি' বললাম বলে কিছু মনে ক'রো না যেন! ত্তাখ লক্ষ্মী, আমি একা একা থাকি। একটা মার্চেন্ট-অফিসে নিরিবিলি চাকরী করি। অফিসেও কথা বলার লোক নেই, বাড়ীতেও নেই। বহুদিন ধরে এই একাকিত্ব ঘোচাবার জন্য চেষ্টা করছি। আজ তোমায় পেলাম। আমার চিঠি পাওয়ার পর একমিনিটও দেরী ক রো না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিও। আমি ডাক-পিওনের শুক্‌নো মুখ চেয়ে রইলাম। ভালবাসা নিও। ইতি

রমা চট্টোপাধ্যায়
২৯৯/১/৫এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর দত্ত লেন,
কলকাতা

পাঁচদিন পর লক্ষ্মীর চিঠি এল।

মাইডিয়ার রমা,

আমিও একটা মনের মানুষ খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। আর তুমি সে ডাকে সাড়া দিয়েছ। তাই আমি তোমায় বরণ করে নিলাম। তুমি এত সরল, এত ভাল, এত আন্তরিক যে চিঠি পড়া শেষ করতে না করতেই তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি। তুমি আমাকে চিঠি দিও,—

আরও আরও অনেক বড় করে,—কেমন? তা না হলে আমি কিন্তু ভীষণ রাগ করব। ভালবাসা নিও। ইতি

তোমার লক্ষ্মী

রমা আমাকে চিঠিটা দেখাল। চিঠি পড়ে আমিও অবাক হয়ে গেলাম। একি! প্রথম চিঠিতেই এমন প্রগাঢ় ভালবাসা! এমন অফুরন্ত প্রেমের ইঙ্গিত! রমার সৌভাগ্যে আমার ঈর্ষা হল। তবুও বন্ধুকে উৎসাহ দিয়ে বললাম বিশাল এক চিঠি লিখতে। রমাও নেশাগ্রস্ত মাতালের মতো চিঠি লিখতে বসল,

জীবনাধিক লক্ষ্মী,

তুমি লিখেছ অনেক বড় করে চিঠি না লিখলে তুমি রাগ করবে। না গো না! রাগ করো না। বড় করেই চিঠি লিখছি। আমি ভাবতে পারিনি লক্ষ্মী যে তুমি আমায় এত ভালবাস। আগে যদি তোমার খোঁজ পেতাম, চিঠি লিখতে লিখতে কতো রিম্ কাগজ যে ফুরিয়ে ফেলতাম তাই ভাবছি। কতদিন ধরে শূন্যমনে ব্যথা পাচ্ছি, অথচ আমি এমন একটা পাঠা যে তোমার খোঁজই পাইনি। যাইহোক, 'গতস্য শোচনা নাস্তি'। যা হয়ে গেছে, তারজন্য চিন্তা না করে যা হতে পারে তার জন্য চিন্তা করা যাক। শুধু আমায় কথা দাও যে তুমি আমায় চিরদিন ভালবাসবে। তোমাকে পাওয়ার জন্য যেন আর ক্যা-ক্যা করে না বেড়াতে হয়। তোমাকে এখনো সশরীরে পাইনি বটে, কিন্তু চিঠির মাধ্যমে তোমাকে পেয়ে বুড়োর সেই কবিতাটা মনে পড়ছে—

'সমাজ সংসার মিছে সব / মিছে এ জীবনের কলরব
কেবল আঁখি দিয়ে / আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব / আঁধারে মিশে যাক আর সব

এমন দিন আমার জীবনে আসবে! যখন শুধু তুমি আর আমি থাকব। আর সব আঁধারে মিশে যাবে।

লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার, আজ এইটুকুই থাক। ইতি

রমা

রমার চিঠির জবাবে লক্ষ্মী লিখল,

প্রাণাধিক রমা

কত ঢং যে শিখেছ ! এমনভাবে চিঠিটা লিখেছ যে মনে হচ্ছে আমাকে পাওয়া যেন কতো শক্ত ব্যাপার ! ভয় নেই আমাকে পাওয়ার জন্য রাবণের মতো সীতাহরণ করতে হবে না, বুঝলে ? হাঁক দিলেই যাব। তবে আর ছ টা মাস ! এরপরই আমার বি. এ. পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে। তারপর শুধু তুমি আর আমি। দু'জন মিলে সেই স্বপ্নের জগৎ গড়ে তুলব। কেমন ? ভালবাসা নিও। ইতি—

শুধু তোমারই লক্ষ্মী

রমা আমাকে চিঠি দেখাল। আমার অনেক মূল্যবান পরামর্শ নিল। তারপর অন্ততঃ তিনবার কেটেকুটে চিঠি সংশোধন করে একটি চিঠি দাঁড় করাল।

মাইডিয়ার লক্ষ্মী,

তোমার চিঠি পড়ে আমার কেবলই মনে হচ্ছে, এত সুখ আমার কপালে সইবে কি ? আমাদের সংসারে মাত্র দু'জন লোক। আমি আর আমার মা ! আমি মায়ের একমাত্র সন্তান। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে তুমি আসবে ত' আমাদের সংসারে ? আমি ত' চাকরী করছি, আর তোমার চাকরীও আমি খুঁজছি, যাতে রেজাল্ট বেরোবার পর নিদেনপক্ষে একটা স্কুলের চাকরীও পাও ! তখন দুজনে চাকরী করব। অফিস থেকে ফেরার পথে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দুজনে মিলিত হয়ে গল্প করে, বাদামভাজা খেয়ে সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরব। কেমন ? ভালবাসা নিও। ইতি—

রমা

চার-পাঁচদিন পর রমা ছুটতে ছুটতে আমার বাড়ী এল। হাতে একটি নীল খাম। বুঝলাম লক্ষ্মীর চিঠি এসেছে। রমা আনন্দে গদগদ হয়ে চিঠিটা আমার হাতে দিল। আমি চিঠি খুলে পড়তে লাগলাম।

মাইডিয়ার রমা,

তোমার চিঠি পেলাম। বিশ্বাস কর, পড়াশুনা এখন ডকে উঠেছে। দিবারাত্র শুধু তোমার চিন্তা। পড়তে পড়তে, খেতে খেতে, রাস্তায় যেতে যেতে

শুধু তোমার চিন্তা। সারারাত শুয়ে শুয়ে তোমার স্বপ্ন দেখি। আমাদের এই রঙীন স্বপ্ন যেন সার্থক হয়! আমি বৈষ্ণব পদাবলী পড়ছি। আঃ কি সুন্দর! লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ / তবু হিয়া জুড়ল না গেল।' তাছাড়া,

'সজনি, অব কি করবি উপদেশ
কানু অনুরাগে মোর তনু-মন মাতল
না শুনে ধরম-লব-লেশ।'

আমার অবস্থাও তাই! তোমার অনুরাগে আমার তনু মন মেতে উঠেছে। পরীক্ষাটা শেষ হলে বাঁচি। আজ এইটুকুই থাক। চিঠির উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমার ভাল করে ঘুম হবে না। বিশ্বাস কর, তুমিই আমার সব। ইতি—

লক্ষ্মী

সত্যিই একদিন লক্ষ্মীর পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। রমা পরামর্শের জন্য আমার কাছে এল। ওরা আর দেরী করতে চায় না। রমা বলল, 'আমি আর দেরী করতে পারব না। ভাবছি একটা শুভদিন দেখে—।' আমি বললাম—'নিশ্চয়ই! শুভস্য শীঘ্রম্। তবে বলছিলাম কি, তোমাদের সবই ত' ঠিকঠাক। মন দেওয়া-নেওয়ার পালাও শেষ; শুধু এখন পর্যন্ত কেউ কাউকে দেখতে পেলে না! তাই বলছিলাম নিদেনপক্ষে দেখা-সাক্ষাতের পালা সেরে ফেল।'

আমার কথায় রমা একটু মুষড়ে পড়লেও একেবারে উপেক্ষা করতে পারল না। বলল,—'এই যে দেখা-সাক্ষাত নেই, অথচ দেখার প্রবল আগ্রহ আছে, এইতো ভাল। যাক, তুমি যখন বলছ তখন এক কাজ করি। দেখাসাক্ষাতের প্রয়োজন নেই, লক্ষ্মীর একটা ফটো চেয়ে পাঠাই।'

আমি বললাম,—'ঠিক আছে, তাতেই চলবে।'

এবার রমা লিখল,—

মাইডিয়ার লক্ষ্মী,

অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম যে আর বৃথা দেরী না করে এবার শুভকাজটা সেরেই ফেলব। লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার, মনা আমার—শুধু তোমার মত পেলেই সব চুকে যায়। বল, তুমি কত তারিখে আমার হবে?

ভালকথা। লক্ষ্মীসোনা! তোমার একটা ফটো পাঠাবে। আমার বন্ধুদের দেখাব। যত শীঘ্র সম্ভব তোমার মত ও ফটো পাঠাবে। ইতি—

রমা

পরের ডাকে লক্ষ্মীর উত্তর এল।

মাইডিয়ার রমা,

তোমার ওপর আমি ভীষণ রাগ করেছি। তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না। কেন? ফটো পাঠাব কেন? তোমার সঙ্গে আমার কি দেখা হতে পারে না? সারাজীবন তোমাকে নিয়ে ঘর করব আর আজ একটু দেখা হবে না?

তুমি শান্তিনিকেতনে এসেও আমার সঙ্গে দেখা করতে পার অথবা আমিও কলকাতা গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি। যদি শান্তিনিকেতনে আস তাহলে আম্রকুঞ্জে আমার সঙ্গে দেখা করবে। গ্রীষ্মের ছুটিতে আম্রকুঞ্জ ফাঁকা থাকে। কবে কখন আসবে জানায়ো। আর যদি আমাকে কলকাতা যেতে হয়, তাহলে কোথায় কখন কবে দেখা করব জানাবে। ইতি

তোমারই লক্ষ্মী

আমি রমাকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখা করবার পরামর্শ দিলাম। রমা আমার পরামর্শ মেনে নিল। লক্ষ্মীকে রমা লিখল,—

মাইডিয়ার লক্ষ্মী,

আগামী রবিবার আমিই শান্তিনিকেতনে যাচ্ছি। তুমি বিকাল সাড়ে পাঁচটায় আম্রকুঞ্জে দাঁড়িয়ে থেক। তখন সব কথা হবে। আজ আর বেশী লিখতে পারছি না।

আমার হৃদয়-নিংড়ানো ভালবাসা নিও আর—। ইতি

রমা

রমা রবিবার দুপুরে বোলপুরে পৌছাল। বৈশাখের অসহ্য রোদে সারা গা ঝলসে যাচ্ছিল রমার। ষ্টেশনের কাছেই একটি চায়ের দোকানে বসে সারা দুপুর কাটাল। আজ বিকালে লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হবে। রমার রক্তে আজ নেশা লেগেছে। লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হওয়ার সেই অসহ্য সুখের কল্পনায় রমা বিভোর হয়ে পড়েছে।

অবশেষে পাঁচটা বাজল। রমা সাইকেল-রিক্সায় চড়ে শান্তিনিকেতনের দিকে রওনা হল। পাঁচটা কুড়ি মিনিটে রমা আম্রকুঞ্জে এসে পৌছাল। কিন্তু কই! লক্ষ্মী ত' আসেনি! শুধু কালো মিশমিশে গাল-চোপড়া ভাঙা রোগা-পটকা এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। রমা ভাবল, লক্ষ্মী এসে পড়লে আর একটু দূরে নিরিবিলিতে নিয়ে গিয়ে কথা বলবে।

রমা একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ছ'টা বেজে গেল। লক্ষ্মী এল না। শুধু এই রোগা পটকা লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। রমা নিরাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত এই কৃশকায় যুবকের শরণাপন্ন হল। রমা বলল.—'শুনছেন। আমি একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি অথচ মেয়েটি এখনো আসেনি। আপনি কি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবেন?'

রমার কথা শুনে ভদ্রলোক শুকনো হাসি হেসে বললেন,—'আমারও একই কেস্।'

রমা বলল, 'যাক ভালই হল। তাহলে আপনার সঙ্গেই গল্প করা যাক। আচ্ছা, আপনার নামটা জানতে পারি?'

—আমার নাম লক্ষ্মী বন্দ্যোপাধ্যায়।'

—'এঁ্যা!'—রমা আর্তনাদ করে উঠল,—তু-তু-তুমি ব্যাটাছেলে!'

—'হ্যাঁ, আমি ত' ব্যাটাছেলে, কিন্তু আপনি কে?'

—'আমি র-র-র—রমা।'

এরপর তুজনই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। শান্তিনিকেতনে সেদিন হৈ-হৈ কাণ্ড। ছাত্র-ছাত্রী-অধ্যাপক—সকলেই চেষ্টা করে তুজনকে হাসপাতালে পৌছে দেন। আমি খবরের কাগজে এই খবর দেখে শান্তিনিকেতনে গিয়ে রমাকে নিয়ে এসে কলকাতায় মেণ্টাল হসপিটালে ভর্তি করি। ডাক্তার বলেছিলেন 'সাংঘাতিক মেণ্টাল শক্।'

অনেক চিকিৎসার পর রমা এখন ভাল আছে। কেবল বিয়ের কথা বললেই অজ্ঞান হয়ে যায়।

সত্যব্রত রায়

অভিনয়

থিয়েটার করার সখ অনেকেরই থাকে। প্রত্যেক পাড়ায়, অলিতে-গলিতে বহুসংখ্যক অভিনেতা বাস করেন। তার মধ্যে অনেকেই আবার পাড়ার দিকপাল অভিনেতা। অভিনেতার পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে প্রত্যেক পাড়ায় অন্তত একজন করে সাজাহান, কিছু চন্দ্রগুপ্ত আর কেদার রায়-সেলুকস-কার্ভালো আছেন। আমাদের পাড়ায় আছেন শ্রীসিদ্ধেশ্বর ট্যাং। ইনি একাই একশ। যেকোন পার্টেই ইনি পাড়া কাঁপিয়ে দেন।

অবশ্য এ গল্পটা সিদ্ধেশ্বর ট্যাংকে নিয়ে নয়। এ গল্পটা নাড়ুদাকে নিয়ে। নাড়ুদা—মানে শ্রীনাড়ুগোপাল বিশ্বাসের অভিনয় করার খুব সখ। তাই তিনি থিয়েটারের মরশুমে পাড়া-কাঁপানো অভিনেতা সিদ্ধেশ্বরবাবুর কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন একটা পার্ট পাওয়ার জন্যে। অবশেষে একবার সিদ্ধেশ্বরবাবু নাড়ুদাকে সুযোগ দিলেন।

থিয়েটার করার সুযোগ পেয়ে নাড়ুদা আনন্দের আতিশয্যে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকেই এই সুসংবাদ দেন। নাড়ুদার স্ত্রী পুনপুন-বৌদিও সংবাদ শুনে খুবই খুশী হলেন।

নাড়ুদা বৌদিকে বললেন,—'ওগো শুনছ, একমাস ধরে পুরোদমে রিহার্সাল চলবে। রোজই বাড়ী ফিরতে রাত বারটা-একটা বাজবে।'

পুনপুন-বৌদি বললেন,—'রোজই অত রাত হবে কেন? আমি কি রোজ রাত্তির একটা পর্যন্ত না খেয়ে বসে থাকব?'

নাড়ুদা বললেন,—'আরে না না, তুমি ততক্ষণ না খেয়ে থাকবে কেন?

তুমি রাতের রান্না-বান্না সন্ধ্যায় সেরে ফেলবে। আর আমি রোজ সন্ধ্যায় খাওয়া-দাওয়া সেরে রিহার্সাল দিতে বেরিয়ে পড়ব।'

বৌদি বললেন,—রোজই কেন অত রাত হবে?'

নাড়ুদা বললেন,—'আমাকে শেষপর্যন্ত থাকতে হবে কি না?'

বৌদি কপটতার ভাব নিয়ে কটমট করে নাড়ুদার দিকে তাকালেও মনে মনে খুশীই হয়েছিলেন। অতএব রোজই বৌদি সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই রান্না সেরে ফেলেন। নাড়ুদাও তাড়াতাড়ি কোনরকমে নাকেমুখে গুঁজে রিহার্সাল দিতে যান। মাঝে মাঝে বাড়ীতে ফিরে এসে বৌদিকে বলেন,—'জান গা, আজ আমার পার্ট দেখে সবাই থ' হয়ে গেছে।' বৌদি খুবই খুশী হন। নাড়ুদা আর বৌদি, দুজনেই প্রতিদিন ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে বলেন,—আর দশদিন—আর পাঁচদিন—আর দুদিন—আর একদিন'—অবশেষে আজ।

সেই বহু প্রতীক্ষিত দিনটি এল। নাড়ুদা আনন্দে আত্মহারা। বৌদি এই দিনটির জন্য একমাস যাবৎ অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। কাজেই তিনিও আহ্লাদে আটখানা। আমারও আনন্দের মাত্রা কম ছিল না।

সেদিন নাড়ুদা সকালেই ক্লাবে চলে গেলেন। কথা ছিল, আমি সন্ধ্যার সময় বৌদিকে নিয়ে যাব। সন্ধ্যা লাগার সঙ্গে সঙ্গে বৌদিকে নিয়ে গেলাম। আমরা সামনের সারিতে বসেছিলাম। দেখতে দেখতে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। এত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে আজ নাড়ুদা পার্ট করবেন! আমি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আনন্দে বৌদির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

যবনিকা সরে গেল। শুরু হল 'সম্রাট' নাটকের অভিনয়। শ্রীসিদ্ধেশ্বর চ্যাং সম্রাটের পার্ট করছেন। সিংহাসনে সম্রাট বসে কি যেন চিন্তা করছিলেন। হঠাৎ এক লাফ দিয়ে উঠে হুঙ্কার দিয়ে বললেন,—

কে আছিস? কে আছিস ওরে?
কেশ ধরি টানি আন্ এবে সে শত্রুরে।
আরে জোরে ক —

আমি মনোযোগ দিয়েই দেখছিলাম, শুনছিলাম। তাই দু লাইনের শেষে 'আরে জোরে ক' শব্দটার অর্থ ঠিক বুঝলাম না। আবার ভাবনার সূত্র ছিঁড়ে

গেল। সম্রাট আবার হুঙ্কার দিয়ে বললেন,

কে আছ কোথায়? রণসাজে সাজি
ঢক্কানিনাদে তোল কাঁপায়ে ধরণী;
অসির ঝন্‌ঝনা আজ চুর্ণ করি দিবে শত্রুকুল
আরে জোরে ক'।

আমি ও বৌদি অবাক হয়ে গেলাম। বোমা ফাটানোর শব্দে এমন কাবিক পার্ট করতে করতে হঠাৎ—'আরে জোরে ক'? পরে বুঝলাম সম্রাটের ভূমিকাভিনেতা সিদ্ধেশ্বরবাবু কানে কম শোনেন। তাই তিনি প্রম্প্‌টারের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে বলছেন,—'আরে জোরে ক'।

দৃশ্যের পর দৃশ্য হতে লাগল। অঙ্কের পর অঙ্ক। এর মধ্যে অনেকেই অভিনয় করে গেলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! নাড়ুদার দেখা নেই। বৌদিও উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রতি পল গুণছিলেন।

নাটক প্রায় শেষ হয়ে এল। আর মাত্র একটি দৃশ্য। এখন পর্যন্ত নাড়ুদা মঞ্চে আসেন নি। অবশেষে শেষ দৃশ্যও শেষ হতে চলল। হঠাৎ দু'জন সৈনিক নাড়ুদাকে ধরে ঝড়ের মত মঞ্চে ঢুকে বললেন,

মহারাজ, আনিয়াছি এবে, এই সেই দুশমন!

নাড়ুদার মুখে কোন কথা নেই। বন্দী নাড়ুদা সম্রাটের দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করছেন। সম্রাট হুঙ্কার দিলেন,

এই সেই দুশমন? যার তরে রণসজ্জা এত?
আজ এই অসি দিয়ে ভূলুণ্ঠিত করি দিব তোরে,
আরে জোরে ক'।

—বলেই সম্রাট এক লাফ দিয়ে তরবারিটা নাড়ুদার পেটে ঠেকালেন। নাড়ুদা আলগোছে মরে পড়ে গেলেন।

সম্রাট হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ শব্দে অট্টহাসি হেসে বললেন,—

নির্মূল করেছি আজি শত্রুরে আমার
মেদিনী কাঁপায়ে আজি বলিব সবারে
আরে জোরে ক'।

জাহাজডুবি

—সম্রাটের মুখ দিয়ে এইটুকু বেরুবার পর নাড়ুদা এক কাণ্ড করে বসলেন। নাড়ুদা মৃতের মতই পড়ে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর ডানহাতটা তুলে সজোরে নিজের ডান পায়ে ঠাশ করে একটা চপেটাঘাত করলেন। দর্শকবৃন্দ চিৎকার করে উঠলেন,—'ওরে মড়ার কাণ্ড ত্থাখ'—'মড়ার রকম ত্থাখ'—

বাড়ী ফিরে এসে নাড়ুদা বললেন,—'আরে আমি ত' মরে পড়ে গেলাম। এদিকে একটা ডাঁশ-মশা পায়ের ওপর বসে এ্যায়সা কামড় দিচ্ছিল—তবু কাঠ হয়ে থেকে বারবার বললাম, 'মশাটা মেরে দে'—তা' ব্যাটারা আমাকে পাত্তাই দিলে না,—তাই ভেবে দেখলাম, মরুকগে যাক। দিই শেষ করে মশাটা—তারপর যা করবি কর।'

পুনপুন-বৌদি কাঁদতে কাঁদতে বললেন,—'মিন্‌সে, লজ্জা করে না? একমাস ধরে আমি খেটে খেটে মরছি আর উনি রিহার্সাল দিচ্ছেন। আর শেষপর্যন্ত কিনা এই পার্ট! তায় আবার মরে গিয়ে মশামারা। এই তোমাদের থিয়েটারের ছিরি।

নাড়ুদা বললে,—'আরে দূর দূর! নিকুচি করেছি অমন থিয়েটারের!

———

সত্যব্রত রায়

নিস্তারিণী দেবী আমাদের পাড়ায় সার্বজনীন খুড়ীমা ছিলেন। আবাল-বৃদ্ধবণিতা তাঁকে খুড়ীমা বলেই ডাকত। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত উল্লেখযোগ্য কৃপণ লোক জন্মেছেন, খুড়ীমা নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে স্থান করে নিতে পেরেছেন। আমাদের এলাকায় খুড়ীমার কৃপণতার খ্যাতি সর্বজনবিদিত।

আত্মীয়-স্বজন বলতে খুড়ীমার কেউ নেই। স্বামী বহুদিন আগেই স্বর্গলাভ করেছেন। নিঃসন্তান এই বৃদ্ধা মহিলা স্বামীর রেখে-যাওয়া ছোট একতলা বাড়ীতে একক জীবনযাপন করেন। একখানি ঘরে তিনি থাকেন। বাকী দুখানা ভাড়া দেন। বাড়ীভাড়া বাবদ তিনি পান পঞ্চাশ টাকা। কোনরকমে গ্রাসাচ্ছাদন চালিয়ে বাকী টাকা যক্ষের ধনের মত একটি পিতলের কলসীতে জমা করেন।

খুড়ীমার একক জীবনে উল্কার মত দেখা দিল বাদল বিশ্বাস। বাদলের পরিচয়ও দিয়ে রাখি। খুড়ীমা যখন তাঁর যৌবনের দিনগুলির কথা চিন্তা করেন, বাদলের প্রসঙ্গ অঙ্গাঙ্গীভাবেই এসে পড়ে। খুড়োর জীবদ্দশায়, যখনই বাদলের হাতে কোন কাজ থাকত না, বাদল খুড়োর নামে মামলা ঠুকে দিত। এহেন বাদল একদিন এসে খুড়ীমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। অভিপ্রায় খুড়ীমার পদসেবা করা।

খুড়ীমার বাড়ীর ভাড়াটে উঠে যাওয়ায় বাদল সস্ত্রীক দুইছেলে নিয়ে উপস্থিত হল। বাদল পঞ্চাশ টাকাতেই বাড়ীভাড়া নিল। খুড়ীমা পূর্ববৎ একখানি ঘরে থাকেন। বাকী দুখানি ঘরে বাদলের সংসার।

খুড়ীমা স্বপাকে খান। দুপুরে একটু আতপচালের ভাত। তার সঙ্গে একটু ডালসেদ্ধ বা কাঁচকলা সেদ্ধ। রাত্রে ছাতু। এইভাবে পয়সা বাঁচিয়ে খুড়ীমা দিনের পর দিন পিতলের কলসীর উদর পূর্ণ করেন।

একদিন বাদলের তিন ছেলে মুসুরী, মটর ও খেঁসারী খুড়ীমার সঙ্গে খুনসুটি শুরু করল। ওরাও বৃদ্ধাকে খুড়ীমা বলেই ডাকত।

মুসুরী বলল,—খুড়ীমা, তোমার পিতলের কলসীতে বুঝি অনেক টাকা?

খুড়ীমার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। তিনি বললেন,—আ পোড়ো-পোড়ো-পোড়ো —আরে আমার কপাল রে—

মটর বলল,—বেশী চিল্লাও যদি, তোমার টাকা কেড়ে নেব।

খুড়ীমা বললেন,—দূর হ হতভাগা, নির্বংশের ব্যাটা!

খেঁসারী বলল,—বেশী ওস্তাদী করলে পাড়ার সবাইকে বলে দেব যে খুড়ীমার কলসীভরা টাকা আছে।

খুড়ীমা বললেন,—ওরে আমার গোল্লায় যায়না যমে-পায়না!

এইভাবে কিছুদিন কাটল। তারপর খুড়ীমার আতঙ্ক দেখা দিল এই ভরা কলসী নিয়ে কি করা যায়! পিতলের বড় কলসীটা সত্যিই টাকায় ভরে গেছে। এখন ভরাডুবির আশঙ্কায় খুড়ীমার চোখে ঘুম নেই। একদিন খুড়ীমা মনস্থ করলেন বাদলের লোহার আলমারিতে কলসীটা রাখতে হবে। ছোটবেলায় বাদল সময় পেলেই খুড়োর নামে মামলা ঠুকতো বটে, এখন সে অনেক ভাল হয়ে গেছে। নিয়মিত বাড়ীভাড়াও দিয়ে যাচ্ছে। ওর কাছে কলসী রাখাই ভাল।

খুড়ীমা তাঁর ভরা কলসীর মুখ ভাল করে বেঁধে বাদলের কাছে রাখতে দিলেন। বাদল সযত্নে লোহার আলমারীতে রেখে দিল। খুড়ীমা মাঝে মাঝে দুইহাত দিয়ে আকারে ইঙ্গিতে বাদলের কাছে জিজ্ঞাসা করেন। কলসীর নাম উচ্চারণ করলে পাছে সকলে তাঁর কলসীর রহস্য জানতে পারে। সেই ভয়ে খুড়ীমা দুইহাত দিয়ে আকারে ইঙ্গিতে কলসীর কথা জিজ্ঞাসা করতেন। বাদলও সবিনয়ে জানাত,--হ্যাঁ ঠিক আছে।

আমরা কেউই চিরস্থায়ী নই। খুড়ীমাও নন, জন্মের পর থেকেই ত' মানুষ একপা একপা করে মৃত্যুর দিকে এগোয়। যাই হোক, বার্দ্ধক্যের জন্য খুড়ীমা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। এই দুর্বলতার সুযোগে জ্বর এল। তিনদিন জ্বরে ভোগার পর টাইফয়েডের দিকে অসুখের মোড় ঘুরল।

তখন খুড়ীমার কথা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু টনটনে জ্ঞান ছিল। বাদল ডাক্তার নিয়ে এসেছে। ডাক্তারবাবু একরকম জবাবই দিলেন। একটু ওষুধ দিলেন বটে, কিন্তু বললেন,—'কথা বন্ধ হয়ে গেছে, শেষ সময় উপস্থিত। এখন ভগবানকে ডাকা ছাড়া আর কোন ওষুধ নেই।

আমরা পাড়ার প্রতিবেশীরা শেষ সময়ে খুড়ীমাকে দেখতে গেলাম। দেখলাম ঘরভর্তি লোক। ডাক্তারবাবু খুড়ীমার শিয়রে বসে আছেন। পায়ের কাছে বসে আছে বাদল। তখনও খুড়ীমার পূর্ণমাত্রায় জ্ঞান ছিল। খুড়ীমা হঠাৎ শীর্ণ হাত দুখানি অনেক কষ্টে তুলে আকারে ইঙ্গিতে কলসীটা চাইলেন। বাদল কাঁদতে কাঁদতে বলল,—'কি চাইছ খুড়ীমা?'

নির্বাক খুড়ীমা আবার হাতদুটি দিয়ে ইঙ্গিতে কলসী চাইলেন।

বাদল কেঁদে বলল,—'কি চাইছ, কাঁঠাল? কাঁঠাল খাবে খুড়ীমা?'

খুড়ীমা ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। আবার আকারে ইঙ্গিতে কলসী চাইলেন।

বাদল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলল,—'তবে কি তরমুজ খাবে খুড়ীমা?'

খুড়ীমা মাথানেড়ে আর একবার হাতের ইঙ্গিতে ভরা কলসীর কথা বোঝাতে চেষ্টা করলেন।

কিন্তু বাদল বুঝল না। সে বলল,—'কাঁঠালও না, তরমুজও না, তবে কি তালপাটালি খাবে খুড়ীমা?'

খুড়ীমার দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

ডাক্তারবাবু বললেন,—'এখন শেষ সময় এসে গেছে। কথা বন্ধ হয়েছে। মনে নানা বিকার দেখা দিয়েছে। তাই হয়ত কাঁঠাল, তরমুজ খেতে চাইছেন। ওসব যেন দেবেন না।'

ডাক্তারবাবুর কথা শেষ হওয়ার আগেই শায়িত খুড়ীমার মাথা ডানদিকে ঢলে পড়ল।

———

নিমন্ত্রণ

'কন্যা কাময়তি রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রিরম্
ভ্রাতরঃ কুলমিচ্ছন্তি মিস্টান্নং ইতরে জনাঃ ॥'—মেয়ে চায় একটা টুকটুকে বর আসুক, মা চান বিত্তমান জামাই, পিতা চান এমন একটা জামাই আসুক যে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, ভ্রাতারা দেখতে চান বংশ, আর আমাদের মত ইতরজনের মুখে শুধু ভোজনের কথা—'কেমন খাওয়ালে হে ?

হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রামের নিরীহ গোবেচারী ভদ্রলোক নির্মল বিশ্বাস তাঁর মেয়ের বিয়েতে ইতরজনের কথাই বেশি করে ভেবেছিলেন। একে পল্লীগ্রাম, লোকের অবসরও প্রচুর, একটু ত্রুটি-বিচ্যুতি পেলে সকলেই নূতন করে কোষ্ঠী তৈরী শুরু করে। তাই নির্মলবাবু তাঁর মেয়ের বিয়েতে খাদ্যের আয়োজনে কোন ত্রুটি রাখেন নি। অবশ্য জামাই-এর কুল, মান, বিত্তেরও কোন অভাব ছিল না।

নির্মলবাবু মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ শুরু করলেন। আগেই বলেছি ইনি ছিলেন অত্যধিক নম্র ও বিনয়ী। তাঁর স্বভাবও এমন চমৎকার ছিল যে তিনি শত্রু মিত্র সকলের কথাতেই হেঁঃ-হেঁঃ-হেঁঃ শব্দে হেসে সায় দিতেন। মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণে বেরিয়ে তিনি গ্রামের প্রতি বাড়ীতে গেলেন। প্রত্যেককে একটি করে কার্ড দিয়ে বললেন,—হেঁঃ-হেঁঃ-হেঁঃ পরশু আমার বাড়ীতে—হেঁঃ-হেঁঃ-হেঁঃ—মেয়ের বিয়েতে হেঁঃ-হেঁঃ-হেঁঃ—আপনারা সবাই হেঁঃ-হেঁঃ-হেঁঃ—"

এমনভাবে প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে নির্মলবাবু করজোড়ে সকলকে নিমন্ত্রণ করে ফিরে এলেন।

সত্যব্রত রায়

লোক খাওয়াবার আয়োজনও হয়েছিল প্রচুর। গ্রামে এত বিপুল আয়োজন একেবারে আশাতীত ব্যাপার। গোধূলি লগ্নে বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য! গ্রামের লোকেরা ত' কেউই আসেন নি। যখন সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেল নির্মলবাবু বাইরে বেরোলেন। কেউ এলেন না কেন, নিশ্চয়ই কোন একটা রহস্য এর পেছনে লুকিয়ে আছে। প্রথমেই তিনি গ্রামের নিরিবাদী ভদ্রলোক শ্রীত্র্যম্বক মৈত্রের কাছে গিয়ে করজোড়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—"এত আয়োজন করলাম—হেঁঃ-হেঁঃ-হেঃ—নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে, আপনারা কেউ—হেঁঃ-হেঁঃ-হেঁঃ—"

ত্র্যম্বকবাবু থমথমে মুখে বললেন,—'কি জানি ভাই, কি যে এদের হয়েছে, কেউ যেতে চাইছে না।'

নির্মলবাবু ত্র্যম্বকবাবুর হাতদুটি চেপে ধরে বললেন,—'হেঁঃ-হেঁ—আমি কি অপরাধ করেছি ভাই?'

ত্র্যম্বকবাবু বললেন,—'তা ত' জানি না, শুধু শুনেছি যে গাঁয়ের মোড়লরা এ বিয়েতে সবাইকে যেতে নিষেধ করেছেন। ওঁদের ভয়ে আমরাও যেতে পারছি না।

নির্মলবাবু প্রমাদ গুণলেন। তারপর অসহায়ের মতো ছুটতে ছুটতে রায়-বাড়ীর দাওয়ায় এসে পৌছলেন। সেখানে বসে আছেন গাঁয়ের প্রধান মোড়ল গোরাচাঁদ রায়, নাকু মিত্র, ন্যাড়া পাল ও নাড়ু বিশ্বাস। নির্মলবাবু বললেন,—'হেঁঃ-হঁঃ-হেঁঃ আপনারা ত গেলেন না! আপনাদের পদধূলি না পড়লে কি করে চলবে? আমার এত আয়োজন—হেঁঃ-হেঁঃ-হেঁঃ—'

গোরাচাঁদ রায় বলেন,—'না, আমরা কেউই যাব না। কারণ আপনার নিমন্ত্রণে ত্রুটি আছে।'

নাকু মিত্র বললেন,—'ঠিক করে নেমন্তন্ন করেন নি, আমরাও অমন খাওয়া খাই না।' অপর মোড়লবৃন্দ এই কথায় সায় দিলেন।

নির্মলবাবু গলদ-গামছা হয়ে বললেন,—'হেঁঃ-হঁঃ-হঁঃ—কি অপরাধ করেছি?'

নাড়ুবাবু বললেন,—'আপনি ত' নেমন্তন্নই করেন নি।'

নির্মলবাবু—'সে কি!—হেঁঃ-হেঁঃ-হঁঃ—পরশু যে এত করে বলে গেলাম।'

বৃদ্ধ মোড়ল অমল গোস্বামী বললেন,—'কি বলেছেন? আপনি ত শুধু বললেন,—'হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ—পরশু আমার বাড়ীতে হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ—আপনারা সবাই

হেঁঃ হেঃ হেঃ—এর মানে কি? আপনারা সবাই হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ মানে কি আমাদের যেতে হবে, না খেতে হবে? কি করতে আমাদের?'

নির্মলবাবু বিবর্ণ মুখে বললেন,—'বড় ভুল হয়ে গেছে হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ'

নির্মলবাবু বারবার ক্ষমা চাইলেন। অবশেষে সকলে নির্মলবাবুকে ক্ষমাঘেন্না করে তাঁর মেয়ের বিয়েতে যেতে রাজী হলেন।

আয়োজনও প্রচুর। গাঁয়ের লোকেরা আহারও করলেন প্রচুর। কয়েকজন শুধু ডাল দিয়েই ছোট ছোট পিতলের বালতির এক এক বালতি ভাত খেয়ে নিলেন। অনেকে ভেবেছিলেন শুধু ডাল দিয়েই এক বালতি করে ভাত খাচ্ছে, পরে খাবে কি? কিন্তু তার জন্য কোন অসুবিধাই হয়নি। শুরুতে এত খাওয়ার পর তিরিশ-চল্লিশ খণ্ড মাছ, আলুকিলো চাটনি, কিলোটাক দই এবং পঞ্চাশ-ষাটটা করে রসগোল্লা-সন্দেশ খেয়ে নিলেন। সকলের খাওয়া শেষ হলে নির্মলবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

খাওয়ার শেষে গাঁয়ের মোড়ল গোরাবাবু তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে তুলতে নির্মলবাবুকে বললেন,—'বাঃ বেশ খাইয়েছ হে। বড় আনন্দ পেলাম।' অন্যান্য মোড়লবৃন্দ তৃপ্তির সঙ্গে ভুঁড়িতে হাত বুলোতে লাগলেন। অপর মোড়ল ঘাড়া পাল বললেন,—'সব ভালই হল। শুধু নেমন্তন্নের সময় 'আহার করবেন' শব্দটা প্রয়োগ করেন নি বলেই কত অঘটন ঘটল।'

এত খেয়েও এমন সমালোচনা করায় নির্মলবাবুর একটু রাগ হয়ে গেল। তিনি গলা-গামছা হয়ে করজোড়ে বললেন—'আহার করতে ডাকিনি—হেঃ হেঁঃ হেঃ—তবে কি প্রহার করতে ডেকেছিলাম—হেঃ হেঃ হেঃ—'

সত্যব্রত রায়

আমার ঠাকুর্দা

—'কে যায়?'
—'আমি কর্তা।'

'কি বললে বেয়াদপ্! আমি বেঁচে থাকতে তুমি কর্তা!'

—সংক্ষেপে এই হল আমার ঠাকুরদার প্রকৃতি পরিচয়। বারান্দায় বসে পথচারীদের সঙ্গে এমন অনেক কথাই বলতেন। আমার ঠাকুর্দা শ্রীরাজীবলোচন তালুকদার কাব্য ব্যাকরণ-ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ ছিলেন অত্যন্ত সিধে লোক। তিনি ছিলেন বজ্রাদপি কঠোর ও কুসুমাদপি কোমল। এমন অবুঝ ভাল মানুষ বদ্‌রাগী ও নরমপ্রকৃতির লোক দেখা যায় না। চিরকালই বয়স্ক মানুষরা বলে থাকেন,—'যেমন হয়েছে আজকালকার ছেলেরা!' কিন্তু ঠাকুর্দা বলতেন,—'যেমন হয়েছে আজকালকার বাবারা!' এবার আশাকরি ঠাকুর্দাকে আপনারা চিনেছেন। তাঁর চেহারা ছিল খুবই মনোরম। ঠাকুর্দার মতন ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়,—এক দাড়িম্ববর্ণ শ্বেত শ্মশ্রুগুম্ফ বিলম্বিত কন্দর্পকান্তি খর্বকায় ঋষি। মুদ্রাদোষ ছিল কথায় কথায় 'নিরেট' 'নরাধম' 'ধ্যাট্ বেয়াদপ' ও 'ভ্যাট্ গর্দ্দভ' বলা।

আমি সেবার ভাগ্যতাড়িত হয়ে অর্থাৎ সরকারী বনবিভাগের চাকরী নিয়ে গিয়েছিলাম হাজারীবাগে। শুরুতে চাকরী পাওয়ার গল্পও একটু শুনিয়ে দিই। আমি বি, এ, পাশ করার পর বহুদিন বেকার ছিলাম। তৎকালীন পশুপালন মন্ত্রীর সঙ্গে ঠাকুর্দার বিশেষ আলাপ ছিল। মন্ত্রীমহাশয়ের বাবা ঠাকুর্দার ছাত্র ছিলেন। ঠাকুর্দা আমাকে নিয়ে পশুপালন মন্ত্রীর বাড়ীতে গেলেন। সোফায়

বসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সেই বাঘের মতো তেজস্বী মন্ত্রীমশাই এলেন। তিনি ঠাকুর্দার পদধূলি নিয়ে বললেন,—ভাল তো ?

ঠাকুর্দা ডান হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করে বললেন,—'কুশলেই আছি।

মন্ত্রীমশাই বললেন,—সঙ্গে এই ছেলেটি কে ?

ঠাকুর্দা বললেন,—এই গর্দ্দভের জন্যই ত আমার আগমন। বি, এ, উত্তীর্ণ হয়ে দুই বৎসর বসে আছে। একটি চাকুরী দিতে হবে।

মন্ত্রীমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন,—বিশ্বাস করুন, আমার চাকরী দেওয়ার কোন হাত নেই !

ঠাকুর্দা—চোপ্ রও বেয়াদপ্। চাকুরী প্রদানে মন্ত্রীর হাত নাই, তবে কি আমার হাত আছে ?

মন্ত্রীমশাই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তিনি কি বলবেন ভেবে পেলেন না। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন,—আমি চাকরী দিতে পারবো না।

ঠাকুর্দা বললেন,—তুমি দেখছি তোমার বাপের চেয়েও নিরেট গদ্দভ। চাকুরী দেওয়ার ক্ষমতা রাখ না অথচ মন্ত্রীপদে বহাল আছে ? ধ্যাৎ বেয়াদপ্।

মন্ত্রীমশাই প্রমাদ গুণলেন। তারপর বললেন, আপনি আজকের মত আসুন। আমি পরে আপনাকে যা হয় জানাব।

তারপরই আমার বনবিভাগের চাকরী।

বনবিভাগের চাকরী নিয়ে গিয়েছিলাম হাজারীবাগে। কয়েকদিন চাকরী করার পর ঠাকুর্দার একটি চিঠি পেলাম,—

নিখিলকল্যাণনিকেতনেষু,

অদ্য তোমার পত্র পাইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ-পুলকে কণ্টকিত হইলাম। অহো! শেষ পর্যন্ত ৺জগদম্বা তোমাকে নিবিড় জঙ্গলে কর্ম্মপ্রদান করিলেন। সাবধান! গহন অরণ্যে কোনরূপ বেয়াদপি করিবে না। হিংস্র-ব্যাঘ্র-সিংহ-গণ্ডার-হস্তী-ভল্লুক-উল্লুকের ত্রিসীমানায় কদাপি ঘেঁষিবে না। অপিচ, গর্দ্দভের ন্যায় কুত্রাপি একাকী বিচরণ করিবে না। দিবারাত্র পশুসঙ্গ করিতে করিতে বন্যমানব হইও না। প্রতিদিবস জাগ্রত কুণ্ডেশ্বরী দেবীর নাম জপ করিবে।

অহো! সারবাক্যগুলিই লিপিবদ্ধ করি নাই। তোমার ন্যায় নিরেট গর্দভ আর ত্রিভুবনে নাই। মাসাধিককাল যাবৎ অনর্থক 'আসিব'

'আসিতেছি' জাতীয় স্তোকবাক্যে ভুলাইতেছে অথচ বেয়াদপের আসিবার নাম নাই। তোমার বিবাহের জন্য সেই এক চন্দ্রবিনিন্দিত কন্যার সন্ধান প্রদান করিয়াছে। অথচ অহেতুক বিলম্ব ঘটাইয়া আমার আয়ুক্ষয় করিতেছে।

পদধূলি প্রদানান্তে—

ইতি আঃ শ্রীরাজীবলোচন দেবশর্ম্মা পঞ্চতীর্থস্য।

ঠাকুর্দার চিঠি পড়েই বুঝলাম তিনি আমার বিয়ের চেষ্টা করছেন। কিন্তু কি লেখা যায়? একটু ব্যাকরণের ভুল হলে বা বেঁফাস কিছু থাকলে কি যে করবেন তা ভগবানই জানেন। তবু বহু চিন্তা করে ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলাম।

শতকোটি প্রণামান্তে নিবেদন এই যে দাদু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুশী হলুম। জঙ্গলে নিরাপদেই আছি। আমি বন-মানুষ হইনি। বরং পশুসঙ্গে মহানন্দে আছি। তাছাড়া আপনি কি করে এমন কথা ভাবেন যে আমি বাঁদর হয়ে যাব। এই কথা পড়ে দুঃখ পেলুম। কুণ্ডেশ্বরী দেবীর নামও শুনিনি, জপ করব কি করে? তাছাড়া কেমন করে জপ করতে হয় তাই জানি না।

ফুলকাকাকে আপনি অপমান করে গাল দিয়েছেন। আমার মনে হয় ফুলকাকা ঠিকই করেছে। কারণ কোন মেয়েকে আমার বিয়ে করার ইচ্ছা নেই। বিয়ের কথা পরে ভেবে চিন্তে দেখবোখন।

আপনি আমার প্রণাম নেবেন। দিদিভাই, মা, বাবা, বড়কা, মেজকা, ফুলকা ও ছোটকাকে আমার প্রণাম দেবেন। ইতি টম্

কয়েকদিন বেশ ফুর্ত্তিতে কাজ করছিলাম। হঠাৎ বেয়ারিং চিঠি এল। ঠাকুর্দার লেখা খামের চিঠি। অত্যধিক ভারী হওয়ায় বেয়ারিং হয়ে গেছে। চিঠি খুলে পড়লাম,—

নরাধমেষু টম্

সংস্কৃতে একটা কথা আছে—'উপদেশোহি মুর্খাণাম্ প্রকোপায় ন শান্তয়ে'—অর্থাৎ উপদেশে মুর্খেরা শান্ত হয় না, ক্রুদ্ধই হয়। তোমরা প্রহারেরও অনুপযুক্ত। তোমার পৃষ্ঠে আঘাত করিলে আমার চটিজুতাও নষ্ট হইয়া যাইবে। বেয়াদপ্ আর কাহাকে বলে? প্রারম্ভেই লিখিয়াছ 'শতকোটি প্রণামান্তে'। উহার অর্থ

বোঝ? একশতকোটিবার প্রণাম করা কি কোন মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব? আর তুমি যেরূপ ক্ষীণজীবী, সত্য সত্যই অতবার প্রণাম করিলে ত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে! লিখিবার সময় কি ভাবিয়া চিন্তিয়া কিঞ্চিৎ বুদ্ধি মেধা ব্যয় করিয়া লিখিতে পার না? ইহার পর লিখিয়াছ—এই যে দাদু!' দুইদিবস চক্ষের আড়াল হইতে না হইতেই শালীনতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছ? পিতামহকে কোন স্থলে এরূপ সম্বোধন করে।

'হলুম্' আবার কোন প্রদেশের ভাষা? অরণ্যে কি ব্যাঘ্রের সহিত ঘর করিতেছ যে 'হালুম হালুম' না করিলে শান্তি পাও না? 'জঙ্গলে নিরাপদেই আছি—ইহার অর্থ? জঙ্গলে কি করিয়া লোকে নিরাপদে বাস করে? 'বন-মানুষ হইনি, বরং পশুসঙ্গে মহানন্দে আঁছি।'—যে আশঙ্কা করিতেছিলাম' পশুসঙ্গে মহানন্দে আছ অথচ বন্যমানব হও নাই? তবে কি 'ওরাং ওটাং' বা উল্লুকের ন্যায় বৃক্ষে বৃক্ষে শাখাপ্রশাখা আন্দোলিত করিতেছ? 'আপনি কি ক'রে এমন কথা ভাবেন যে আমি বাঁদর হয়ে যাব? যেমন সুমধুর ভঙ্গী, তেমন সুললিত ভাষা! যেন মধুচক্র হইতে পোয়াটাকে মধু ঝরিয়া আছে; বেয়াদপ! ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছে। শাখামৃগ হইতে কি বিলম্ব আছে? আর বৃক্ষশাখে না বসিলে কখনও পাণ্ডিতের পৌত্র এইরূপ পত্র লিখিত না। 'এই কথা পড়ে দুঃখ পেলুম'—নেহাৎ আমি বলিয়া চুপ করিয়া আছি, অন্য কেহ হইলে এইরূপ ভাষা দেখিয়া পাদুকাঘাতে ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দিত! 'কুণ্ডেশ্বরী দেবীর নাম শুনিনি, জপ করব কি করে?' —শতাধিক দেবদেবীর পূজার্চ্চনা করিতে করিতে চল্লিশবর্ষ পূর্বে আমার শ্মশ্রু-গুম্ফ শ্বেতবর্ণ হইয়াছে, আর আমার পৌত্র দেবীর অস্তিত্বই জানে না! তোমার পিতা পর্যন্ত আমার সম্মুখে একথা ভাবিতেও প্রকম্পিত হয়।

'ফুলকাকে আপনি অপমান করে গাল দিয়েছেন—একবার সম্মুখে পাইলে হইত! নিজ সন্তানকে উদ্দেশ্য করিয়া কটুবাক্য বলিলে সন্তানের মানের হানি হয় এই ধারণা কিসে জন্মাইল? নিবিড় অরণ্যের গণ্ডারটা কি তোমাকে এইরূপ শিক্ষা দিতেছে? 'কোন মেয়েকে আমার বিয়ে করার ইচ্ছা নেই।'—অহো! কোন পুতিগন্ধময় নরকে প্রবেশ করিলে মানবসন্তান এরূপ লেখে! ওরে গর্দ্দভ নারীকে বিবাহ করিবার বাসনা নাই, তবে কি পুরুষকে বিবাহ করিবি? এরূপ বিচিত্র বাক্য, আমি ত' কোন ছার, আমার চতুর্দ্দশপুরুষেও

তো কদাপি শোনে নাই। কোন ভল্লুক কি তোমাকে এরূপ মন্ত্রণা দিয়াছে? 'দেখবোখুন' শব্দটা কি গভীর অরণ্য হইতে আবিষ্কার করিয়াছ? তোমার ন্যায় নিরেট পৃথিবী ত' দূরের কথা গ্রহান্তরেও নাই।

'বড়কা, মেজকা, ফুলকা, ছোটকা'—এগুলির অর্থ? তুমি কি পশুদের ভাষা লইয়া গবেষণা করিতেছ? এগুলি মৎস্য, মনুষ্য, না পক্ষী? এগুলির দ্বারা খুল্লতাতদিগের কথা বুঝাইয়া থাক, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে নিবিড় জঙ্গলই তোমার উপযুক্ত স্থান।

'ইতি টম্'—তোমার পিতার দেখিতেছি দূরদৃষ্টি আছে। নতুবা মাতৃক্রোড়ে থাকিবার কালেই কি করিয়া তোমাকে চিনিতে পারিয়া নাম রাখিল 'টম্'। ইংলণ্ডদেশায় এক ম্লেচ্ছের কুকুরের নাম ছিল 'টম্'। তোমার পিতার চিন্তাশক্তি দেখিয়া পুলকিত হইতেছি।

অত্র পত্র পাইবামাত্র পঞ্জিকা দেখিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে। নতুবা কি যে করিব জানিনা।

ইতি

শ্রীরাজীবলোচন পঞ্চতীর্থস্য

কিন্তু আমি মহা মুস্কিলে পড়ে গেলাম। মাত্র মাসখানেক চাকরী করছি। ছুটী পাব কি করে! তাছাড়া ছুটী নিয়ে বাড়ী গেলেই ত' সেই চন্দ্রবিনিন্দিত মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। তার চেয়ে না যাওয়াই ভাল। তাই ঠাকুর্দাকে লিখে দিলাম,—

শ্রীচরণেষু দাদু,

যেতে পারলুম না। বনবিভাগে কয়েকহপ্তা কাজ করতে না করতে ছুটী নেওয়াটা ভাল দেখা যায় না। আর পাঁজী দেখে যেতে বলেছেন। এখানে পাঁজী পাওয়া যায় না আর পাঁজীর নামও কেউ শোনেনি। তবু আপনার কথামত আমার এক বন্ধুর মারফৎ 'ফুল' মার্কা পাঁজী এনেছি। পাঁজী খুলেই ভড়কে গেলুম। আমি পাঁজীর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না। পাঁজী খুলেই দেখি লেখা আছে- সিংহ দং ০।৫।২৫ গতে উদয়, ঘং ১।৫২।৪২ গতে নৌকাগঠন নাট্যারম্ভ হলপ্রবাহ ধান্যচ্ছেদন মাষ কলাই ভক্ষণ মৎস্য সম্ভোগ। ঘং ১২ দং ৯ পং ১৪ মধ্যে নিম্ব পরে তালভক্ষণ নিষেধ।

জাহাজডুবি

পাজী দেখে আমার মাথা ঘুরে গেছে। মনে হচ্ছে দুরূহ অঙ্কের উত্তর লেখা আছে। আর পাতায় পাতায় চীনদেশের ভাষা—দং ঘং রং চং পং ছড়ানো আছে। এগুলি দেখে কি করে যাত্রা করতে হয়? এগুলির মধ্যে কি ট্রেন ছাড়ার সময় দেওয়া আছে?
প্রণাম জানালুম। ইতি

শ্রীপশুপতি তালুকদারস্য (টম্)

ডাকে চিঠিখানি দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত ছিলাম। এবার চিঠি পড়ে ঠাকুর্দা অচ্ছা জব্দ হবেন! উপদেশ দেওয়া, বিয়ে দেওয়া, পাঁজী দেখা—সব চুলোয় যাবে। ঠাকুর্দার জব্দ হওয়ার দৃশ্য কল্পনা করে বেশ রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম। ছ দিন পর দাদুর চিঠি এল।

পরমস্নেহভাজন পশু,

আমি বত্রিশপ্রকার উন্মাদের চিকিৎসা করিয়াছি। অদ্যাবধি কোন উন্মাদও ত এরূপ চিঠি লেখে নাই বা সুস্থ অবস্থাতেও এই জাতীয় বাক্য কহে নাই! অথচ তুমি অনায়াসে এমন জঘন্য কথা লিখিলে? তোমার 'পশুপতি' নামটা অবশ্য তোমার পিতামহী প্রদান করিয়াছিল। সে কিঞ্চিন্মাত্র বিদ্যার্জ্জন করে নাই অথচ এত অসীম দূরদৃষ্টি পাইল কি প্রকারে? তোমার পিতামহী নাম দিয়াছিল 'পশুপতি' আর তোমার পিতা প্রদান করিয়াছিল 'টম্'। কিমাশ্চর্যম্! মাতাপুত্র উভয়েই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা।

পুনরায় 'পরলুম' লিখিয়াছ? 'বনবিভাগে ছুটী নেওয়াটা ভাল দেখা যায় না'— ছুটী লইবেই বা কেন? শ্বাপদশঙ্কুল অরণ্যের ব্যাঘ্র-ভল্লুক-উল্লুকের মায়া কে ত্যাগ করিতে পারে? আর ভো বেয়াদপ্। যত্র কেহ পঞ্জিকার নাম অবধি শ্রুত হয় নাই, সেই ছাগবুদ্ধি অধ্যুষিত এলাকায় তোমার চাকুরী করিবার প্রয়োজন নাই। 'পাঁজির মাথামুণ্ড বুঝতে পারি না'—অহো কি গর্দ্দভ! পাঁজীর কি মুণ্ড আছে? এই বুদ্ধি সম্বল করিয়া কি প্রকারে বি. এ. উত্তীর্ণ হইলে?

তোমার পঞ্জিকা দেখিবার দৌড় দেখিয়া আমি দুইঘণ্টাব্যাপী অজ্ঞান হইয়াছিলাম। 'নৌকাগঠন নাট্যারম্ভ হলপ্রবাহ ধান্যচ্ছেদন মাষকলাই ভক্ষণ মৎস্য-সম্ভোগের সহিত যাত্রার কি সম্পর্ক রে বেয়াদপ্! গৃহে প্রত্যাগমনের

ব্যাপারে 'নিম্বভক্ষণ' বা 'তালভক্ষণের'ই বা কি সম্বন্ধ? এইরূপ গণ্ডমূর্খ ত কুত্রাপি দেখি নাই!

এইরূপ প্রণালীতে পঞ্জিকা দেখিলে তোমার গোময়পূর্ণ মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইবে নাই বা কেন? রে গর্দ্দভ! ওগুলি পাটীগণিতের উত্তর নহে। দং খং রং চং পং চীন প্রদেশের ভাষা নহে। ওঃ একে ছাগের ন্যায় বুদ্ধি তাহার উপর ষণ্ডের ন্যায় আচরণ! ট্রেন ছাড়িবার সময় কি পঞ্জিকায় থাকে?. নিবিড় জঙ্গলে কালাতিপাত করিয়া 'ওরাং ওটাং'-এরও ঊর্দ্ধে উঠিয়াছ? পুনঃ সেই 'জানালুম' প্রয়োগ করিয়াছ?

তোমার পশুসঙ্গে মহানন্দে থাকিবার প্রয়োজন নাই। কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া আগামী রবিবার সকাল ৯-৪১ মিনিট গতে অরণ্য হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিবে। তোমার জন্য স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকুরী ঠিক করিয়াছি। তোমরা পদধূলিরও অনুপযুক্ত। ইতি

আঃ শ্রীরাজীবলোচন পঞ্চতীর্থস্য

ঠাকুর্দ্দার নির্দ্দেশমত চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম। বাড়ীতে ঢুকতেই ঠাকুর্দ্দার ঘর। বাড়ীর কাছাকাছি এসেই নানা চিন্তায় বিশেষ ভীত হয়ে গেলাম। কি জানি, ঠাকুর্দ্দা আবার কি করে বসবেন? দুরুদুরু বুকে ঘরে ঢুকতেই দেখি ঠাকুরর্দ্দা দাঁড়িয়ে আছেন। এক বৃদ্ধ পণ্ডিত হাঁটু মুড়ে বসে ঠাকুর্দ্দার পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রণাম করছেন আর ঠাকুর্দ্দা ডান হাত তুলে বিড়বিড় করে সংস্কৃতে আশীর্ব্বাদ করছেন। ঘরের মেঝেতে এক তরুণী ছাত্রী বসে ছিল।

বৃদ্ধ পণ্ডিত প্রণাম সেরে ঠাকুর্দ্দাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—পণ্ডিতমশাই কুশলে আছেন তো?

ঠাকুর্দ্দা বললেন,—'আর ধ্যাট্, বেয়াদপ্! কুতঃ কুশলমস্মাকম, আয়ুর্যাতি দিনে দিনে!

বৃদ্ধ পণ্ডিত একটু অপ্রতিভ হলেন! তারপর তিনি বিনয়ের সঙ্গে বললেন,

—মানে আমি জিজ্ঞেস করছি বেশ বহাল তবিয়তে আছেন তো?

—ভ্যাট্ গর্দ্দভ! পঁচাআশি বর্ষে বহাল তবিয়তে!

ঠাকুর্দার এই উত্তরে বৃদ্ধ পণ্ডিত একটু ঢোক গিলে চুপ করে ঘরের এককোণে

গিয়ে বসলেন।

ঠাকুর্দা তাঁর খাটে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে সেই তরুণী ছাত্রীকে পড়ানো শুরু করলেন। বললেন,—সমাসই বোঝ না, অথচ সংস্কৃত পড়তে এসেছ! কী নিরেট!

ছাত্রী জবাব দিলেন,—'সত্যি বলছি, কিছু মনে থাকে না।'

ঠাকুর্দা বললেন,—'মনে না থাকার ব্যাপারটা যে সত্য তা তোমার মস্তকের আকার দেখলেই বোধগম্য হয়। তোমার চোখের দৃষ্টি দেখলেই প্রতীয়মান হয় যে তুমি ছাগবুদ্ধিসম্পন্না।' ঠাকুর্দার এই মন্তব্যে মেয়েটি লজ্জায় মাটিতে মিশে গেল।

ঠাকুর্দা আবার বললেন,—'গর্দ্দভীর ন্যায় বৃথা কালহরণ না করে একটি শ্লোক প্রণিধান কর,—

"দ্বন্দ্ব দ্বিগুরপিচাহং মদ্গেহে নিত্যমব্যয়ীভাবঃ
তৎপুরুষ কর্ম্মধারয় যেনাহং স্যাং বহুব্রীহিঃ"

অর্থাৎ আমরা একাধিক প্রাণী, আমার গৃহে নিত্য অভাব, তাই হে কর্ম্মধারক, এমন কিছু কর, যাতে আমরা বহু সম্পদযুক্ত হই।—এই শ্লোক কণ্ঠস্থ কর।' —এই কথা শেষ করেই ঠাকুর্দা ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখতে পেলেন। বাক্যব্যয় না করে তিনি চটিজুতা হাতে নিয়ে দাঁড়ালেন। আমি ছুটে গিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি চটি হাতে নিয়েই বিড়বিড় করে সংস্কৃতে আশীর্ব্বাদ করতে লাগলেন। ঘা'কতক দেওয়ার আগেই আমি ছুটে বাড়ীর ভিতরে গেলাম। সামনে একটি শিকার পেয়েও হাত ফসকে যাওয়ায় ঠাকুর্দার মুখনিসৃত একটি শব্দই কানে এল,—'অহো!'

আমি একদৌড়ে ভিতরে গিয়ে দিদিমাকে প্রণাম করলাম। দেড়মাস পরে নাতির মুখ দেখে দিদিমা আনন্দে আত্মহারা হলেন। ফোকলা হাসি হেসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। এমন সময় ঠাকুর্দা চটিজুতা হাতে নিয়ে আমার দিকে তেড়ে এলেন। রাগে উত্তেজনায় তাঁর দাড়ি তখন থরথর করে কাঁপছে।

দিদিমা ত্রাস্তেব্যস্তে বললেন,—তুমি কি আক্কেলের মাথা খেয়েছ? এতদিন পরে নাতিকে দেখে চটি হাতে ছুটে আসছ?

ঠাকুর্দা বললেন,—ব্যাট্ বেয়াদপ্!

সত্যব্রত রায়

দিদিমা বললেন,—কি ! আমাকে বেয়াদপ্ বলা হচ্ছে ? কি আমার পণ্ডিত !—একেবারে ল্যাজকাটা পণ্ডিত !

ঠাকুর্দা বললেন,—ভ্যাটু গর্দ্দভী !

আর বেশীদূর গড়াল না। কারণ ইতিমধ্যে আমার বাবা এসে পড়েছেন। বাবাকে দেখে ঠাকুর্দা যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে সস্থানে ফিরে গেলেন। ঠাকুর্দা বাবাকে শাসন করতেন আবার একটু সমীহও করতেন। তাছাড়া জ্যেষ্ঠপুত্রের সামনে তার মাকে শাসন করা সমুচিত নয় ভেবেই ঠাকুর্দা এ যাত্রায় দিদিমাকে ছেড়ে দিলেন।

বাড়ীতে সকলের সঙ্গে আমার আরণ্যক অভিজ্ঞতার গল্প হল। আমি দেড়মাসের মধ্যে জঙ্গলে একমাত্র খরগোস ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। তবু হিংস্র বাঘের মুখোমুখি হওয়ার রোমহর্ষক গল্প শোনাচ্ছিলাম। সকলে গালে হাত দিয়ে সেই গল্প উপভোগ করছিল।

এমন সময় ঠাকুর্দার গলার 'রে রে রে রে' শব্দে সকলেই শশব্যস্তে ঠাকুর্দার ঘরে ঢুকলাম। ঠাকুর্দা চটি হাতে নিয়ে বাড়ীর ঠাকুর পঞ্চুকে তাড়া করছেন। বাবা জিজ্ঞাসা করলেন,—কি ব্যাপার।

ঠাকুর্দা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন,—পঞ্চু বেয়াদবকে প্রতিদিন পাঠাভ্যাস করালাম অথচ নিজের স্ত্রীকে এরূপ চিঠি লিখেছে ?

বাড়ীর ঠাকুর পঞ্চু ঠাকুর্দার কাছে নিয়মিত পড়ে বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ শেষ করেছে, হাতের লেখা শিখেছে। আজ গোপনে স্ত্রীকে একটি চিঠি লিখেছে অথচ তা ভুল করে ঠাকুর্দার পঞ্জিকার ভেতর রেখে এসেছে।

তখনও পঞ্চু থর থর করে কাঁপছে।

ঠাকুর্দা পঞ্চুকে বললেন,—বল্ নিরেট বেয়াদপ্। নিজ স্ত্রীকে কে কবে এরূপ চিঠি লেখে ? তোর একমাত্র ঔষধ লাঠ্যৌষধি।

বাবা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি লিখেছে চিঠিতে !

'তবে শোন' গর্দ্দভ বৌকে কি লিখেছে ?,—এই বলে ঠাকুর্দা চিঠি পড়তে লাগলেন,—

শ্রীচরণকমলেষু,

বধুমাতা, এই তালে তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ করিবে। অহো ! বহুদিন

তোমায় দেখি না। পূজার সময় যাইব। গেরামের লোককে দিয়া চিঠি লিখাইয়াছ অথচ তাহাতে এমন গোপন কথা লিখতে লজ্জা পেলেনি! ধ্যাট্ বেয়াদপ্।

ইতি

নমস্ত পঞ্চু

পঞ্চু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল,—'ঠাকুর্দা, এই তালে ছেড়ে দিন। আর অমন চিঠি লিখবো নি!'

ঠাকুর্দা রেগে কাঁপতে কাঁপতে জবাব দিলেন,—লক্ষ্মীছাড়া নিরেট! নিজ স্ত্রীকে কে 'শ্রীচরণ কমলেষু' লেখে! স্ত্রীকে 'বধূমাতা' সম্বোধন করে প্রণাম জানাতে কিঞ্চিৎ দ্বিধা হল না!

বাবা তীব্র হাসি দমন করতে করতে ফিরে এলেন। আমরা তখনও ঘটনা প্রবাহ দেখছি।

পঞ্চু বলল,—বড় ভুল হয়ে গেছে ঠাকুর্দা!

ঠাকুর্দা বললেন,—ধ্যাট্ বেয়াদপ্! ফের যদি স্ত্রীকে প্রণাম জানাতে দেখি, ফের যদি এমন গুরুচণ্ডালে চিঠি দেখি তো জুতো দিয়ে কান মলে দেব।

আমার ছোটবোন প্রিয়ংবদা (ঠাকুর্দারই দেওয়া নাম) বাড়ীর সকলেরই বিশেষ আদরের মেয়ে। ঠাকুর্দা তাঁর এই কনিষ্ঠা নাতনী সম্পর্কে স্নেহে একটু দুর্বল ছিলেন। প্রিয়ংবদার ওপর দাদু কখনই বজ্রাদপি কঠোর হতে পারতেন না। গান-বাজনার প্রতি দাদুর চিরকাল গাত্রদাহ ছিল। কিন্তু প্রিয়ংবদাকে গান শেখানোর ব্যাপারে তিনি আপত্তি করলেন না।

ঠাকুর্দা স্থানীয় গানের মাষ্টারমশাই পৌঢ় ভদ্রলোক নরেশবাবুকে ডেকে পাঠালেন। ঠাকুর্দা তাঁকে একটি হারমোনিয়ম কেনার জন্য টাকা দিলেন। নরেশবাবু নিজেই দেখেশুনে হারমোনিয়ম কিনে আনলেন।

ঠাকুর্দা চশমা চোখে দিয়ে হারমোনিয়ামের 'রিড্'গুলি বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করে বললেন,—অহো? সব রিড্ত' একই প্রকার।

নরেশবাবু বললেন,—আজ্ঞে, রিড্ত সবগুলি একরকমই দেখতে হয়!

ঠাকুর্দা বললেন,—তবে এগুলিকে সা রে গা মা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয় কেন?

নরেশবাবু বললেন,—ও আপনি বুঝবেন না, প্রিয়ংবদা ঠিক বুঝবে।

ঠাকুর্দা বললেন,—ধ্যাট্ বেয়াদপ্।

নরেশবাবু হকচকিয়ে গেলেন। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন,—আপনি কিছু ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঠাকুর্দা বললেন,—প্রিয়ংবদা ছেলে মানুষ! একপ্রকার রিড থাকায় ওর পক্ষে সারেগামাপাধানিসা পৃথক পৃথক ভাবে চেনা সম্ভব নয়। কাজেই পৃথক পৃথক ভাবে চিহ্নিত রিডযুক্ত হারমোনিয়ম্ আনয়ন কর।'

নরেশবাবু বললেন,—অমন হারমোনিয়ম্ তো পাওয়া যায় না।

ঠাকুর্দা বললেন,—ধ্যাট্ বেয়াদপ!

ঠাকুর্দা নিজেই যখন বারবার চেষ্টা করে 'সারেগামাপাধানিসা'র কোনটাই খুঁজে পাচ্ছেন না, তখন প্রিয়ংবদা পারবে কি করে? কাজেই নরেশবাবুর উপস্থিতিতেই ঠাকুর্দা একটি সাদা কাগজে 'সারেগামাপাধানিসা' লিখে কাঁচি দিয়ে গোল করে কেটে কেটে আাট টুকরো কাগজ তৈরী করলেন। নরেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করে করে সেই আাট টুকরো কাগজ গঁদের আঠা দিয়ে রিডের ওপর এঁটে দিলেন।

ঠাকুর্দা নরেশবাবুকে বললেন,—আগামীকল্য প্রিয়ংবদাকে 'মজিল মনভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে' গানটি অবশ্যই শেখাবে।

নরেশবাবু আমতা আমতা করে বললেন,—আজ্ঞে, প্রথমেই ও গান কেমন করে শেখাব। আগে কয়েকমাস গলা সাধুক, সুর ভাঁজুক।

ঠাকুর্দা আশ্চর্য হয়ে বললেন,—এরূপ নিরেট ত' কুত্রাপি দেখি নাই।

নরেশবাবু বললেন,—মানে ব্যাকরণের মতো ধাপে ধাপে এগোতে হয়।

ঠাকুর্দা—ধ্যাট্ বেয়াদপ!

নরেশবাবু ম্লানমুখে বললেন,—প্রিয়ংবদা দু'একমাস পরে আপনাকে ভক্তিমূলক গান শোনাবে। আপাতত আমি আপনাকে একটা গান শোনাচ্ছি।

নরেশবাবু হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে সাধক কমলাকান্তের সেই গান শুরু করলেন,—'মজিল মনভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে'

আগেই বলেছি ঠাকুর্দা ছিলেন বজ্রাদপি কঠোর, কিন্তু কুসুমাদপি কোমল। গানের প্রথম লাইন শুনেই তিনি শিশুর মতো উচ্চস্বরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। ঠাকুর্দাকে এমন করে কাঁদতে দেখে নশেরবাবু একেবারে থ'হয়ে গেলেন। ঠাকুর্দা চোখ মুছতে মুছতে বললেন,—'গাও বেয়াদপ গাও।'

জাহাজডুবি

নরেশবাবু আবার শুরু করলেন,—

'যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হৈল কামাদি কুসুম সকলে'

এবার ঠাকুর্দা নিজেকে একেবারেই সামলাতে পারলেন না। উঃ উঃ উঃ উঃ শব্দে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। আর আমরা সত্যিই কি নরাধম ' ঠাকুর্দা ভক্তির অশ্রুজলে ভেসে যাচ্ছেন, আর আমরা পাশের ঘরে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছি। আমার হাসির আওয়াজ একটু জোরে হয়েছিল। ঠাকুর্দা কাঁদতে কাঁদতেই তা শুনতে পেয়ে চিৎকার করে বললেন,—'অফ্! কে রে বেয়াদপ্!' আমরা ছুটে বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেলাম।

সেদিন ভোরের আকাশ খুব নির্মল প্রশান্ত ছিল। বাড়ীর ছাদে টবের গাছগুলিতে খুব সুন্দর ফুল ফুটেছে। মৃদু মৃদু বাতাস বইছে। চারিদিকে বসন্তের ছোঁয়া। পূবের আকাশে সিঁদুর রঙের সূর্য উঠেছে। ঠাকুর্দা স্নান সেরে সিক্ত কাপড়ে হাতযোড় করে সূর্যপ্রণাম করছেন,—

'ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং...

এমন সময় পাশে বাড়ীর ছাদে মাইকে গান বেজে উঠল,—

লিলি তোমার খুনসুটি
দুষ্টুমি আর মিটিমিটি
মুচকি হাসি দেখে আমি পাগলপারা হই !
কই কই কই! আমার লিলি কই!
লি-পম্-পম্ লি-পম্-পম্ লি-পম্-পম্-লি...

ঠাকুর্দা মাইকের দিকে তাকিয়ে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন,—'চোপরও বেয়াদপ্! কিন্তু মাইক থামল না। আবার ভেসে এল সেই গান।

ঠাকুর্দা মাইকের ঔদ্ধত্যে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন,—'অহো! কি কামোন্মত্ত!'

ঠাকুর্দা অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে পট্টবস্ত্র পরে পূজায় বসলেন। ঠাকুর্দা চোখ বুঁজে কুম্ভক করে বসেছেন, এমন সময় আবার পাশের বাড়ীর সেই বেয়াড়া মাইক থেকে গান ভেসে এল—

তেরা মহব্বৎ একনা সাচ্চা দিল্ তো লুট লিয়া
মেরা কলিজা এতনা কম্‌জোর, বুদ্ধু বন গিয়া

ঠাকুর্দা পূজার আসন ছেড়ে সোজা পাশের বাড়ীতে ছুটলেন। সেখানে

গিয়ে দেখি ঠাকুর্দা চটিজুতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দাড়ি থর থর করে কাঁপছে। ঠাকুর্দার ঋষিতুল্য চেহারা দেখে সকলেই শ্রদ্ধা করত। পাশের বাড়ীর মধ্যবয়সী অভিভাবক হাতজোড় করে বললেন,—'আপনার পূজা শেষ হয়নি একথা আমার খেয়াল ছিল না। বড় ভুল হয়ে গেছে।'

ঠাকুর্দা বললেন—রে গর্দ্দভ! পঞ্চাশোর্দ্ধে এখনও এই রুচি? সকালবেলা অন্নপূর্ণা মহাভারত, তা না খেমটা-নৃত্যের গান? ফের যদি এরূপ অশ্রাব্য সঙ্গীত আমার কর্ণগোচর হয় ত পাদুকাঘাতে সমুচিত শিক্ষা দেব।

ভদ্রলোক মাথা হেঁট করে জুলপি চুলকোতে লাগলেন।

প্রিয়ংবদার জন্য একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা প্রয়োজন। গানের মাষ্টারমশাই এসেছেন। এবার লেখাপড়ার জন্য আর একজন মাষ্টারমশায়ের প্রয়োজন। আমার মেজভাই একজন ভাল ছাত্রকে নিয়ে এল। এই নূতন মাষ্টারমশাই খুব লাজুক মুখচোরা লোক। ঠাকুর্দা তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক করতে এসে বললেন,—তোমার নাম?

—আজ্ঞে, শিবশম্ভু ভট্টাচার্য

—নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' প্রয়োগ করতে হয় জান না? তোমরা কোন শ্রেণী, কোন গোত্র?

—আজ্ঞে আমরা ব্রাহ্মণ।

—আরে ধ্যাৎ বেয়াদপ্! আমরা জিজ্ঞাস্য কোন শ্রেণী এবং কোন গোত্র?

—আজ্ঞে, তা বলতে পারলাম না।

—অহো! নিরেট গর্দ্দভ! ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণের তনয়, অথচ এগুলি জান না! সংস্কৃত জান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বি. এ. তে আমার সংস্কৃত ছিল। কাজেই সংস্কৃত খুব ভাল জানি।

—সাধু সাধু! বলতো 'অনডুহ' শব্দের চতুর্থীর দ্বিবচনে কি হয়?

—আজ্ঞে, মানে অনেকদিন আগে পড়েছি, ভাল করে ঠিক মনে নেই।

—অফ্! এত স্বল্প স্মরণশক্তি, কি নিরেট!

এমন সময় বাবা এসে পড়লেন। বাবাকে দেখে ঠাকুর্দা নূতন মাষ্টারমশায়ের সামনেই বললেন,—'এরূপ স্বল্প স্মরণশক্তি বিশিষ্ট! 'অনড়ুহ' শব্দের রূপ জানে না!'

বাবা বললেন,—প্রিয়ংবদাকে পড়ানর জন্য সংস্কৃত জানার কি দরকার? উনি যেটুকু জানেন, প্রিয়ংবদার পক্ষে তাই যথেষ্ট। বাবার মধ্যস্থতায় নূতন মাষ্টারমশাই নিযুক্ত হলেন।

একদিন আমার ফুলকাকা মালদহ থেকে আমার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এলেন। পাত্রীপক্ষ অর্থাৎ মেয়ের বাবা-কাকা-জ্যাঠামশাই ঠাকুর্দার ঘরে পাকা কথাবার্ত্তা বলছেন। বাবা আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন এবং ইঙ্গিতে পাত্রীপক্ষের অভিভাবকদের প্রণাম করতে বললেন। আমি ওঁদের তিনজনকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই দাদু বললেন,—'ধ্যাট্ গর্দভ! গুরুজনকে সম্মান দিতে শেখ নাই! বেয়াদপ্ নিরেট! আমি জলজ্যান্ত বসে আছি, অথচ আমাকে প্রণাম করলে না!

আমি লজ্জিত হয়ে দাদুকে প্রণাম করলাম। দাদু সকলের সামনেই আমার জুলপি ধরে টেনে দিলেন।

অবশেষে মহা সমারোহে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের দিন বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য। ঠাকুর্দা সেদিন বাড়ীময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। উপর নীচ এঘর ওঘর থেকে প্রতি মুহূর্ত্তে ঠাকুর্দার কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগল,—'ধ্যাট্ বেয়াদপ'—'ধ্যাট গর্দভ'—'কি নিরেট!'

ঠাকুর্দা কথায় কথায় উত্তেজিত হতেন, কথায় কথায় কেঁদে উঠতেন। কিন্তু কারুর মৃত্যুসংবাদে কাঁদতেন না। মৃত্যুসংবাদ শুনে কাউকে কাঁদতে দেখলে বলতেন,—'আরে নিরেট! মৃত্যুই তো স্বাভাবিক পরিণতি। বিধর্মী মাইকেলের 'জন্মিলে মরিতে হবে' পড় নাই! বেয়াদপ, কোথাকার!' সে কথা এখন থাক।

আমার বিয়ে ভালভাবে মিটে গেল। ঠাকুর্দাকে কখনও রসিকতা করতে দেখি নি। এই প্রথম দেখলাম আমার স্ত্রীকে তিনি 'ওহে উপগিন্নী' বলে সম্বোধন করছেন।

ঠাকুর্দা তাঁর খাটে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে আছেন। ওঁর সামনে আমার স্ত্রী। ঠাকুর্দা বললেন,—'ওহে উপগিন্নী! আমাকে পছন্দ হয়?'

সত্যব্রত রায়

কোন উত্তর না পেয়ে ঠাকুর্দা বললেন,—'কথা কও না যে !'

এবার আমার স্ত্রী জবাব দিল,—হ্যাঁ পছন্দ হয়। চলুন না আজ বিকেলে 'একবাণ্ডিল প্রেম' সিনেমা দেখে আসি।

ঠাকুর্দা বললেন,—ভ্যাট্ গর্দভী !'

এমন ভাবে রসভঙ্গ হওয়ায় আমার স্ত্রী চমকে উঠল। ঠাকুর্দার রসিকতা এইটুকুই দেখেছিলাম।

বিয়ের কয়েকদিন পর স্ত্রীকে নিয়ে মালদহে আমার শ্বশুরবাড়ীতে গেলাম। সেখানে পনের দিন জামাই আদরে কাটল। চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্-পেয় নানা খাদ্যে শরীরে একটু মেদও জমল। পনের দিন ধরে শ্বশুরবাড়ীর মহা উপকার সাধন করে শাশুড়ীকে কান্নায় ভাসিয়ে তাঁর মেয়েকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম।

বাড়ীতে ঢোকার আগে একহাঁড়ি মিষ্টি কিনলাম আর ঠাকুর্দার জন্য স্পেশাল কাঁচাগোল্লা। বাড়ীর কাছাকাছি এসেই হরি-সংকীর্তনের আওয়াজ শুনতে পেলাম। ঠাকুর্দা নিশ্চয়ই এই ব্যবস্থা করেছেন।

কিন্তু বাড়ীতে ঢুকতেই পাথর হয়ে গেলাম। চেয়ে দেখি ঠাকুর্দার একটি বড় ফটো ফুলমালা দিয়ে সাজানো হয়েছে। সামনে ধূপ জ্বলছে। আর সেই ফটোর সামনে একদল লোক কীর্তন করছেন। বহু পণ্ডিত সেই কীর্তনে যোগ দিয়েছেন। একি ঠাকুর্দা নেই ! এমন করে হঠাৎ তিনি চিরবিদায় নিয়েছেন। ঠাকুর্দাকে দেখে কত হাসাহাসি করেছি, কিন্তু আজ ফটোর দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। ঠাকুর্দা আর পৃথিবীতে নেই। দুচোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। মনে হল আমাকে কাঁদতে দেখে ফ্রেমের আড়াল থেকে ঠাকুর্দা বলছেন,—'আরে নিরেট ! 'জন্মিলে মরিতে হবে' এটাও জান না ! বেয়াদপ্ কোথাকার !'

সমাপ্ত

জাহাজডুবি

সত্যব্রত রায়

রচিত

কাব্যগ্রন্থ

'একটি শিশির বিন্দু' গ্রন্থের প্রতিটি কবিতাই স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় বিমণ্ডিত। এই আত্মসমাহিত কবি হৃদয় নিংড়ে কবিতাগুলি লিখেছেন। শব্দচয়ন, অঙ্গবিন্যাস, মন ও মননের যোগে প্রতিটি কবিতাই রসোত্তীর্ণ। জীবনবোধের গভীরতা এবং সূক্ষ্ম অনুভূতির ঐশ্বর্য কবিতাগুলিকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। তাই কবিতাগুলি এতো মর্মস্পর্শী, যা পাঠের পরেও মনে দীর্ঘছায়া ফেলে যায়।

*　　　*

আধুনিক মন আর চিরন্তনধারা, দুটি ধারায় হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে উঠেছে যে সুর তারই ভাবপ্রকাশ ছন্দ আলেখ্যে রূপায়িত হয়েছে এই সংকলনের অনেকগুলো কবিতায়। 'তৎ সবিতুর্বরেণ্যং', 'শ্রীমধুসূদন, 'একাকী' অগ্নি ও স্বাহা, 'লক্ষ্মীন্দর' প্রভৃতি অনেকগুলো কবিতাই কবির স্বকীয়তার স্বাক্ষর।

এ কবি নিশ্চয়ই কাব্য-সাহিত্যের আসরে নিজের স্থান করে নিতে পারবেন।

সত্যব্রত রায় ঐতিহ্যনিষ্ঠ কবি। তাঁর কবিতা প্রকৃতির মতই আলো জল হাওয়ার দাক্ষিণ্যে সজল-স্নিগ্ধ। শ্রীরায়ের প্রতি কবিতাই যেন রূপবদ্ধ হৃদয়ের বিচিত্র সংলাপ। কবিতাকে শেষ পর্যন্ত একটা বিশেষ প্রত্যয়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করাই কবির অভিষ্ট। জীবনের বেদনা, বৈফল্য, গ্লানি, হতাশা সবকিছুকে মন্থন করে হৃদয়ের নিবিড় সারাৎসারে নিজেকে উজ্জীবিত করে তুলতে কবি অক্লান্ত। ফলত তাঁর কবিতা অনুভব ও অভিজ্ঞতায় বিচিত্রবর্ণ হয়ে ওঠে। জীবনের রসরূপে নিবেদিত প্রাণ আত্মসমাহিত কবি স্বাগত ভাষণের ভঙ্গিতে যা উচ্চারণ করেন তাই কবিতা হয়ে ওঠে। যে কারণে, শ্রীরায়ের কবিতায় প্রতিশ্রুতি এবং প্রত্যাশা সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। শব্দবিন্যাস, চিত্রকল্পের সাংকেতিকতা এবং অনুভূতির ঐকান্তিকতায় তাঁর রচনা হৃদ্য হয়ে ওঠে। যেমন, 'আমার শব্দ তোমার সত্তার পাড়ে কেবল মাথা কুটছে/একটা কবিতা হয়ে ওঠার জন্য', কিংবা—'যুগে যুগে আসে প্রেম তোমার আমার ছায়া বয়ে'তবু তা অতৃপ্ত রয় - বসন্তবাতাস গেল কয়ে।'